কুমারী সরস্বতী দেবী
বউ কোরান

গিয়েও তুমি যাওনি চলে, আছ মোদের কাছে,
তোমার স্মৃতি ফুলের মত ছড়িয়ে নিত্য আছে।
কাজ তোমার করব মোরা সমস্ত প্রাণ দিয়ে—
দেব-সাহিত্যের [illegible]

—সচিত্র নূতন সংস্করণ—

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

দাম—এক টাকা

প্রকাশক—শ্রীঅমূল্যরতন বন্দ্যোপাধ্যায়
পরিচালক—দেব-সাহিত্য-কুটীর
৫৪।৭, কলেজ ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা।

১৩৪৫

প্রিণ্টার—শ্রীঅভয়পদ গঙ্গোপাধ্যায়
"নিউ-কমলা প্রেস"
৩৮, বেচু চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা।

প্রীতি-উপহার
কলিকাতা
কলেজ ষ্ট্রীট
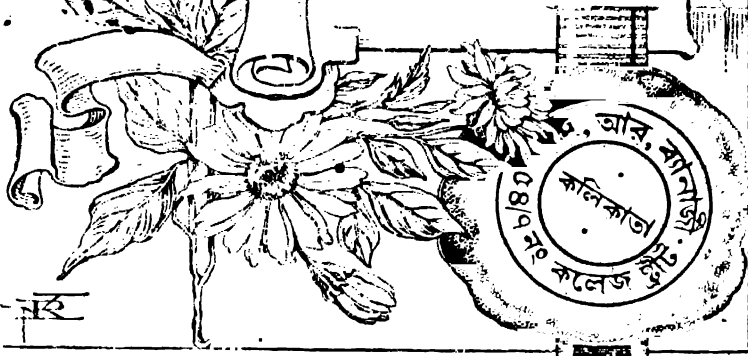
শ্রীমতী

সে-অঞ্চলে পালিতদের নাম কাহারও অজ্ঞাত ছিল না—যাহাকে চলিত কথায় "নামডাক" বলে, সেটা পালিতদের খুবই ছিল। কিন্তু আমরা যে-সময়ের কথা বলিতেছি, তখন নাম আর ডাক ছাড়া আর বড় কিছু ছিল না। চঞ্চলা কমলা যেমন অতর্কিতভাবে সম্পদ প্রদান করিয়াছিলেন, তেমনই অতর্কিতভাবেই তাহা লইয়া গিয়াছিলেন। যে চর পড়ায় সামান্য গাঁতিদার ঈশ্বর পালিতের নামটা সে-অঞ্চলে ডাকিয়া উঠিয়াছিল, দুই পুরুষ যাইতে না যাইতে সে চর ভাঙ্গিয়া নদীর অপর পারে জমী পড়ায়, অযথা মামলা-মোকর্দ্দমায় ঘরের টাকা পরকে দিয়া ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র মহিমারঞ্জন অতি সাধারণ গৃহস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। জমীদারী প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছিল—ঘরে টাকা ছিল না; অথচ প্রকাণ্ড বাড়ী—সারাইতে যে খরচ পড়ে, তাহারও অভাব হয়, সে বাড়ীর উপযুক্ত লোকজন রাখাও অসম্ভব। আরও ছিল সারি সারি কয়টি মন্দির। তখন লোক টাকা হইলে প্রথমে দেবসেবার আয়োজন করিত। বোধহয়, আপনাদের দুরবস্থা বুঝিতে পারিয়া দেবতারা একে-একে নদীগর্ভে আত্মবিসর্জ্জন দিয়াছেন—একে-একে পাঁচটি মন্দির নদীতে গিয়াছে, একটি যায়-যায়, কেবল একটি এখনও নদী হইতে একটু দূরে আছে। মন্দিরের উপর অশ্বত্থ গাছ জন্মিয়াছে।

ঈশ্বরচন্দ্রের বিধবা পুত্রবধূ প্রতিদিন প্রাতে স্নানের পর যাইয়া মন্দিরে প্রণাম করিয়া আসিতেন। সঙ্গে যাইত একমাত্র পুত্র বিশ্বনাথের প্রথম পক্ষের কনিষ্ঠপুত্র নরনাথ। পিতামহী বালককে সঙ্গে লইয়া মন্দিরের দ্বারে দাঁড়াইতেন—তিনিও প্রণাম করিতেন, বালকও প্রণাম করিত। তারপর বৃদ্ধা মন্দিরের দ্বার খুলিতেন—দ্বারের অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছিল যে, খুলিতে ও বন্ধ করিতে শব্দ হইত। সশব্দে দ্বার খুলিয়া প্রণামান্তর বৃদ্ধা আবার সশব্দে দ্বার বন্ধ করিতেন—তাহার পর বালককে সঙ্গে লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিতেন। এই কনিষ্ঠ পৌত্রটি পিতামহীর বিশেষ প্রিয় ছিল; তাহার মাতৃবিয়োগের পর পিতামহীই তাহাকে পালন করিয়াছেন। বৃদ্ধার ইচ্ছা ছিল না যে, পুত্র বিশ্বনাথ বিপত্নীক হইয়া আবার বিবাহ করেন। কিন্তু তাহা হয় নাই। বিশ্বনাথ আবার বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার আর দুই পুত্র—শিবনাথ ও হরনাথ—কিছুতেই বিমাতার প্রতি প্রসন্ন হইতে পারে নাই। কিন্তু যে নরনাথ পিতামহীর অঙ্কেই পালিত—যাহার সহিত বিমাতার সম্বন্ধ সর্ব্বাপেক্ষা অল্প ছিল—সেই নরনাথই কোন দিন বিমাতার প্রতি কোনরূপ অপ্রসন্নভাব প্রকাশ করে নাই। পিতা যে বলিয়াছিলেন—"এই তোমার মা"—তদবধি সে মনে করিতে চেষ্টা করিয়াছে—এই তাহার মা। এ মা যে সে মা'র মত সুন্দরী নহেন;—এ মা যে মা নহেন পিতামহী তাহা বলিয়াছেন, তবুও সে মনে করিতে চেষ্টা করিত—এই তাহার মা।

নরনাথের একটা সুবিধা ছিল—বিমাতা কখন সপত্নীপুত্রদিগের প্রতি বিমাতার আচরণ করেন নাই। সে ভাব তাঁহার ধাতুতে ছিল না। তাঁহার স্নেহের অন্য অবলম্বনও স্থায়ী হয় নাই। একটিমাত্র কন্যা

কেবল যেন তাঁহাকে সন্তানের শোক-বেদনার স্বরূপ জানাইবার জন্যই জন্মিবার তিন বৎসরের মধ্যে লোকান্তরিত হয়। সন্তানকে ছাড়িয়া থাকা কত কষ্টকর, তাহা বুঝিয়া তদবধি তাঁহার হৃদয় সপত্নীর জন্য সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিত—এই সব সোনার চাঁদ ছেলে ছাড়িয়া তিনি কোথায় ? বিষয়কার্য্যে ব্যস্ত স্বামীর ব্যবহারে তিনি সে শোক ভুলিতে পারিলেন না।—সপত্নীপুত্রদিগকে—বিশেষ কনিষ্ঠ নরনাথকে লইয়া ভুলিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তিনি জানিতেন, নরনাথ তাঁহার 'নেওটো' হয়, ইহা শাশুড়ীর বিশেষ অভিপ্রেত ছিল না। কাজেই তিনি নরনাথকে যতটা কাছে পাইতে ইচ্ছা করিতেন, ততটা কাছে লইতে পারিতেন না।

কিন্তু বিমাতা যে তাহাকে ভালবাসেন, তাহা নরনাথ বুঝিত এবং পিতামহীকে অসন্তুষ্ট না করিয়া যতটা তাঁহার স্নেহ সম্ভোগ করা যায়, ততটা করিতে চেষ্টার ত্রুটী করিত না। এইরূপ চেষ্টা—এইরূপ ভাব-গোপন নরনাথের বয়সে সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু তাহার বুদ্ধিও প্রখর ছিল—আর পিতামহীর উপদেশে ও কথায় সে যেরূপে গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহা তাহার মত বয়সের ছেলের প্রায় দেখা যায় না।

বিদ্যালয়েও সে সর্ব্বদাই সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিত—শিক্ষকেরা তাহার বুদ্ধির ও ব্যবহারের প্রশংসা করিতেন।

তাহার কাজে বা ব্যবহারে কোনরূপ ত্রুটী ধরিবার অবসরও বড় কেহ পাইত না।

পিতামহী প্রায়ই বলিতেন, নরনাথ পরিবারের ভাগ্যলক্ষ্মীকে ফিরাইয়া আনিবে, সে কথা সে সর্ব্বদাই স্মরণ করিত। সে যত বড় হইতে লাগিল, তত তাহার সেই চিন্তা বাড়িতে লাগিল—তাহার উপর এই

গুরু ভার ন্যস্ত—সে পরিবারের ভাগ্যলক্ষ্মীকে ফিরাইয়া আনিবে। এই জীর্ণ গৃহ সংস্কারের, ভগ্ন দেবালয় পুনঃপ্রতিষ্ঠার, সংসারে অভাবের স্থানে প্রাচুর্য্য আনিবার ভার তাহার। পিতামহী তাহাকে লইয়া যখন দেব-মন্দিরে প্রণাম করিতে যাইতেন, তখন তিনি মনের যে বেদনা দেবতার পদে নিবেদন করিতেন, নরনাথ শৈশব হইতে সে সকলের স্বরূপ বুঝিবার চেষ্টা করিত। ক্রমে সে যত বড় হইয়াছিল, তত তাহা বুঝিয়াছিল—প্রাচুর্য্যের উচ্চচূড়া হইতে অভাবের আবর্জ্জনাস্তূপে পতিত হওয়া বড় দুঃখের—সেই দুঃখের বেদনা পিতামহীর বুকে দিবা-রাত্রি কণ্টক বেধের মত অনুভূত হইতেছে। এ ব্যথা তিনি কিছু-তেই গোপন করিতে পারেন না। নরনাথ সঙ্কল্প করিয়াছিল, এ ব্যথা সে দূর করিবে। পিতামহী বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছেন—কেবল সময়ে কুলাইলে হয়। কেন না, বালকের পক্ষে অর্থ উপার্জ্জন করা সম্ভব নহে—তাহা প্রাপ্তবয়স্কেই সম্ভব।

যে এই ভাবটা মনে রাখে, সে সাফল্য লাভ করে।—তাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষাই তাহাকে সাফল্য লাভের শক্তি প্রদান করে।

নরনাথের আর দুই ভ্রাতার এই ভাবটারই অভাব ছিল। তাই পাঠে তাঁহাদের তেমন মনোযোগ ছিল না। তাঁহারা অবস্থা বুঝিতে পারি-য়াই নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন—বসতবাড়ীটুকুও রাখিবার উপায় নাই! পিতা কেবল মামলার পর মামলার সৃষ্টি করিতেছেন—সময় পাইবার জন্য। প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্রের ব্যবহারে তিনি বড় বিরক্ত হইয়াছিলেন—ইহাদের কাছে তিনি যত আশা করিয়াছিলেন, সে সবই ব্যর্থ হইল! এমন করিয়া কেবল সময় লইয়া—কেবল মামলার সৃষ্টি করিয়া এবং অভাবগ্রস্ত সংসারের অভাব আরও বাড়াইয়া সব আয় জিলার উকিল,

মোক্তার, ষ্ট্যাম্পে খরচ করিয়া কতদিন চলিবে ? তিনি কথায়-কথায় বিরক্ত হইতেন—চটিয়া উঠিতেন। পুত্ররাও যথাসম্ভব পিতাকে বর্জ্জন করিত। এইরূপে পিতাপুত্রে একটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক অসদ্ভাবের উদ্ভব হইয়াছিল।

বালক নরনাথ কিন্তু এই ভাবটা মোটেই ভালবাসিত না। দাদারা কেন হাল ছাড়িয়া দিলেন ? কেন এমনভাবে হতাশ হইয়া পড়িলেন ? কই—সে ত একবারও হতাশ হয় নাই ! সাফল্য যে চেষ্টার ফল—আগ্রহে লভ্য, এই বিশ্বাস তাহার মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল।

কিন্তু সাফল্য তখনও বিদ্যালয়ে পরীক্ষার সীমায় আবদ্ধ।

মনে এই ভাব লইয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের স্কুল হইতে নরনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষা দিল। পরীক্ষা দিতে তাহাকে জিলার সদরে যাইতে হইল। বিশ্বনাথ পুত্রকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। পিতামহী তাহার যাত্রার পূর্ব্বাহ্ণে তাহাকে দেব-মন্দিরে লইয়া যাইয়া দেবপ্রণাম করাইয়া আনিলেন—দেবপূজার বিল্বপত্র লইয়া তাহার চাদরে বাঁধিয়া দিলেন ; দেবতার কাছে প্রার্থনা জানাইলেন, "ঠাকুর, মনের কামনা পূর্ণ করিও।"

দেবতা তাঁহার সে কাতর প্রার্থনা অপূর্ণ রাখেন নাই। যখন পরীক্ষার শেষ ফল বাহির হইল, তখন দেখা গেল—পল্লীগ্রামের এই ছেলেটি সহর-মফস্বঃলের সব ছেলেকে পরাজিত করিয়া পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তিলাভ করিয়াছে !

নরনাথের এই সাফল্যে আর যে-ই কেন বিস্মিত হউক না—সে নিজে বিস্মিত হইল না ; আর বিস্মিত হইলেন না, তাহার পিতামহী। বাহিরের লোক বিস্মিত হইল—পাড়াগেঁয়ে ছেলের সাফল্যে। আর সেই সময় বিশ্বনাথ বিস্মিত হইলেন, আর একটা ব্যাপারে। নিকট-

বর্ত্তী গ্রামের যে সুদখোর মহাজনের কাছে তাঁহার সম্পত্তি বন্ধক ছিল, এবং যিনি সম্পত্তিটুকু গ্রাস করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন, সহসা তাঁহার গ্রাসচেষ্টা শিথিল হইয়া গেল। তিনি জিলায় আপন উকিলকে লিখিলেন, "বিশ্বনাথ পালিতের ডিক্রীটা যেমন আছে থাকুক—এখন আর কিছু করিবেন না।" এমন কি ডিক্রীজারী করিতে বিলম্ব করিলে ভবিষ্যতে অসুবিধা হইতে পারে, উকিলবাবু এইরূপ কথা লিখিলেও তিনি লিখিলেন, "ডিক্রী ত আর পচিয়া যাইতেছে না! আমি যখন যাইব, তখন সাক্ষাতে সব ব্যবস্থা করিব।"

আপনার উকিলের কাছে এই অপ্রত্যাশিত সংবাদ পাইয়া বিশ্বনাথ অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন।

কিন্তু বিশ্বনাথের আর এক ভাবনা হইল—নরনাথকে পড়াইতে হইবে; তাহার খরচ যোগাইতে হইবে! বড় তুই ছেলে পড়া শেষ করিয়া বাড়ীতেই বসিয়া ছিল—নরনাথ পড়িতে কলিকাতায় যাইবে। তাহার বৃত্তির টাকা থাকিলেও মেসের খরচ, পুস্তকেরমুল্য, এ সব ত দিতে হইবে! আরও দিতে হইবে, তাহার উপযুক্ত কাপড়চোপড়ের খরচ। তাঁহাকে চিন্তিত দেখিয়া তাঁহার স্ত্রী কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিশ্বনাথ বলিলেন, "আমার মাথা আর মুণ্ডু। শুনে তুমি কি করবে?"

তাঁহার এমন মেজাজে স্ত্রী অভ্যস্তা ছিলেন। তিনি বলিলেন, "শুন্‌লেও কি দোষ?"

"ছেলে তিনটের মধ্যে বড় তুটোই ত অকেযো। নরু ভাল হয়ে পাশ হয়েছে, কিন্তু আর পড়াই কেমন করে?"

যেমন ক'রেই হ'ক পড়াতে হবে।"

"তুমি ত বলে খালাস। ম্যাও ধরে কে?"

"কেন, কত টাকা ?"

"যত টাকাই কেন হ'ক না, দেয় কে ? দু'দুটো বৎসর। মাসে যদি কুড়িটা করেও টাকা দিতে হয়; দু বৎসরে প্রায় পাঁচশ' টাকা!"

"আড়াই শ' টাকাতে ত একবৎসর হবে—আমার হার-চুড়ী বেচলে সে টাকা পাওয়া যাবে। তারপর দেখা যাবে।"

"তোমার বুদ্ধি শুনলেই হয়েছে! তারপর না এদিক না ওদিক ?"

স্ত্রী আর কিছু বলিলেন না। অপরাহ্নে শাশুড়ী যখন আহারান্তে একটু গড়াইতেছিলেন, তখন তাঁহার কাছে যাইয়া বসিলেন এবং বলিলেন, "মা, নরু ত পাশ হ'ল—এখন ঐ হ'ল ভরসা, ওকে ত পড়াতে হবে!"

শাশুড়ী বলিলেন, "হুঁ।"

শাশুড়ীর বিরক্তিতেও বধূ অভ্যস্তা হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আজ প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিলেন, কিছুতেই বিচলিতা হইবেন না বলিলেন, "দুবৎসরে প্রায় পাঁচ শ' টাকা দরকার, আমার হার আর চুড়ী বেচে শ' আড়াই টাকা হ'তে পারে। কিন্তু আর আড়াই শ'র উপায় কি?"

শাশুড়ী উঠিয়া বসিলেন। বধূ যে এতটা ত্যাগস্বীকার করিবেন, সে আশা তিনি করেন নাই। তিনি বলিলেন, "যদি আড়াই শ' হ'লেই হয়, আমি দেব। আমার বিশখান মোহর আছে, তাই দেব।"

শাশুড়ী-বধূতে শেষ কথা হইয়া গেল।

তাহার পর শাশুড়ী বধূকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি বিশ্বনাথকে একথা বলেছ ?"

বধূ বলিলেন, "হাঁ।"

শাশুড়ী ছেলেকে জানিতেন। তাঁহার ভয় হইল, পাছে ছেলে টাকা হাতে পাইলে কোন মামলা ফাঁদিয়া বসে এবং শেষে নরনাথের সময়মত টাকা পাইতে অসুবিধা হয়।

তিনি বলিলেন, "আমার মোহরের কথা এখন কা'কেও কিছু বলো না। তুমি হার আর চুড়ী আমাকে দিয়ে যেও—যা' করবার আমি করব।"

রাত্রিকালে বিশ্বনাথ আহারে বসিলে মা বলিলেন, "এইবার ত নরুকে কলকাতায় পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হয়।"

বিশ্বনাথ বলিলেন, "টাকার যোগাড় করছি।"

"তোর হাজার ভাবনা; একা মানুষ—আর কত দিক দেখবি? আমার যেমন কপাল! এ ভাবনা তোকে আর ভাবতে হবে না। বৌমা আমার কাছে দু'খানা গয়না দিয়ে গেছে—তা'তেই একবৎসর কেটে যাবে।"

"এক বৎসর ত কাটবে। কিন্তু তা'র পর?"

"সে ভার আমার রইল। একটা মাষ্টারীও ত পেতে পারে! না পায়, আমি যেমন করে পারি পড়াব। এখন ওই ত শিবরাত্রির সল্‌তে।"

"কিন্তু ভাল ক'রে ভেবে দেখ, শেষে যেন একটা গোলমাল না হয়।"

"আমরা ভাল করেই ভেবে দেখেছি। আচ্ছা, শিবু আর হরনাথ কি একটা কোন কাযকর্ম্ম কর্‌তে পারে না ?"

"কাযকর্ম্ম করবে আমার মাথা আর মুণ্ডু। ওরা যদি 'মানুষ' হ'বে, তবে কি আর আমায় রাতদিন মাথায় আগুন জ্বেলে ঘুরতে হয় ?"

নরনাথ কলিকাতায় আসিল।

যে-মেসে সে বাসা লইল, সে-মেসের সব ছেলেই তাহাকে একটু শ্রদ্ধা করিত—প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিত; কেন না, সে বৃত্তি পাইয়াছে—পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে।

অবনীমোহন নামক একটি ছাত্র নরনাথকে সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিত এবং যেন চেষ্টা করিয়া তাহার সঙ্গে বন্ধুত্ব করিত। সে ছেলেটির সঙ্গে নানা বিষয়ে নরনাথের বিশেষ প্রভেদ ছিল। নরনাথ অত্যন্ত সুরূপ কিন্তু সে ছেলেটির রংও ময়লা—শ্রীও ভাল নহে। নরনাথ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান পাইয়াছিল, সে কোনরূপে তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিল। নরনাথের পিতার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না, তাহার পিতা তেজারতী- কারবারে বেশ দু'পয়সা করিয়াছিলেন। নরনাথের পিতার সম্পত্তিটুকু তাঁহারই কবলে যাইবার সব আয়োজন প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু অবনীমোহন যেভাবে নরনাথের পরামর্শ লইত ও তাহার অনুকরণ করিত, তাহাতে মনে হইত, সে যেন নরনাথের ছায়া।

প্রকৃত কথা এই, অবনীমোহনের পিতা নরনাথের সাফল্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিল এবং পুত্রকে সর্ব্বতোভাবে তাহার অনুকরণ করিয়া চলিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া, তিনি মনে-মনে আরও একটা সঙ্কল্প আঁটিয়াছিলেন, এবং সেই জন্যই বিশ্বনাথের বিরুদ্ধে ডিক্রীটা লইয়া আর নাড়াচাড়া করিতেছিলেন না।

এদিকে প্রধান পাওনাদারের এই শৈথিল্যে বিশ্বনাথ যেন একটু হাঁফ ছাড়িবার অবকাশ পাইয়াছিলেন। প্রতিদিন সদরে যাওয়া বা লোক পাঠান—বাজে খরচের ও মামলার ন্যায্য খরচের সংস্থান করা—উকিল মোক্তারের বাসায় ধন্না দেওয়া, এ সব যেন কয় বৎসর তাঁহার নিত্যকর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আদালতের আমলা হইতে পেয়াদা পর্য্যন্ত সকলের কাছে তিনি পরিচিত ছিলেন।

নরনাথকে কলিকাতায় পাঠাইবার ব্যাপারে বিশ্বনাথের সংসারে আর একটু সুরাহা দেখা গেল। বিশ্বনাথ যে আবার বিবাহ করেন, ইহা তাঁহার মাতার অভিপ্রেত ছিল না। ছেলের উপর রাগ প্রকাশ করিবার সাহস তাঁহার ছিল না—সে রাগটা বিরক্তিরূপে রূপান্তরিত হইয়া বধূর উপর পড়িত। কিন্তু নরনাথকে কলিকাতায় পাঠাইবার প্রস্তাব শুনিয়াই বধূ যখন স্বতঃপ্রবৃত্তা হইয়া আপনার যৎসামান্য অলঙ্কারের প্রায় অর্দ্ধাংশ দিয়া দিলেন, তখন শাশুড়ীর সে ভাবের পরিবর্ত্তন হইল। নরনাথের প্রতি প্রকৃত স্নেহে তিনি শাশুড়ীর যে সন্তোষবিধান করিতে পারেন নাই, আড়াই শত টাকার গহনা দিয়া সেই সন্তোষ ক্রয় করিতে পারিলেন। মানব-চরিত্রজ্ঞ কোন ইংরাজ রাজনৈতিক বলিয়াছেন—সব মানুষকেই কিনিতে পারা যায়—তারতম্য কেবল মূল্যে। তেমনই সব মানুষেরই চিত্ত জয় করা যায়—কেবল তাহার দৌর্ব্বল্যটুকু জানা চাহি। বধূর কাছে শাশুড়ীর মনের দৌর্ব্বল্যটুকু লুকান ছিল না; এখন তিনি তাহার সুযোগগ্রহণের অবকাশ পাইলেন এবং সে অবকাশের সদ্ব্যবহার করিলেন। ঔষধ ধরিতে বিলম্ব হইল না। শাশুড়ীবধূতে যে ভাব এত দিন উভয়েরই অস্বস্তির কারণ হইয়াছিল, এই ব্যাপারে তাহা দূর হইয়া গেল।

বিশ্বনাথ লক্ষ্য করিলেন, নরনাথ যে দিন কলিকাতায় গেল, ঠিক তাহার পরের দিন হইতে শাশুড়ী ও বধূ প্রতিদিন একসঙ্গে ঘাটে যাইতেন এবং প্রতিদিন উভয়ে ভগ্নপ্রায় মন্দিরে দেবতার কাছে প্রার্থনা করিতেন—ঠাকুর, নরনাথকে মানুষ কর—আবার তোমার ভগ্নমন্দির সংস্কৃত করি,—আবার তোমার সেবার সুব্যবস্থা করি—পালিত-পরিবারের নামডাকের ভগ্নচূড়া আবার গড়িয়া তুলি।—সে কাযে ভরসা কেবল নরনাথ।

চারিদিকে লোক নরনাথের প্রশংসা করিত এবং তাহাতে পিতামহীর হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। কেবল তাহাই নহে, ছুটীতে নরনাথ বাড়ী আসিলে তিনি দিনের পর দিন সর্ব্বসাধারণের সেই সব প্রশংসার কথা তাহার কর্ণে ঢালিয়া দিতেন। সে সব কথা নরনাথের কাছে যেমন প্রীতিপদ মনে হইত, তাহাকে তেমনই সাফল্যলাভে উৎসাহিত করিত। পিতামহী বাল্যকাল হইতেই তাহার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছিলেন যে, সে সাধারণ ছেলে নহে।

নরনাথ যখন কলিকাতায় যায়, তখন সে মনে করিয়া গিয়াছিল, যদি সুবিধা পায়, একটা ছেলে পড়ান চাকরী লইবে—বাড়ীর অবস্থা সে বেশ বুঝিয়াই গিয়াছিল। কিন্তু কলেজে ভর্ত্তি হইবার পর সে কলিকাতার হালচাল লক্ষ্য করিয়াছিল এবং ছেলেপড়ানোর পারিশ্রমিক প্রভৃতির সন্ধান লইয়াছিল। ফলে সে সে-সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছিল। তাহার কারণ অনেকগুলি। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র—তাহার সহপাঠীরা প্রায়ই ধনীর সন্তান—নব্যচালে তাহারা দারিদ্রকে ঘৃণা করে। সে অবস্থায় নরনাথ ছেলে পড়াইলে তাহাদের সঙ্গে আর সমানভাবে মিশিতে পারিবে না। মনের যে বল থাকিলে মানুষ ধনীর উপেক্ষাকে

উপেক্ষা করিতে পারে—যাহার জন্য সেকালে এ-দেশে দরিদ্র পণ্ডিত রাজসভায় যাইবার আহ্বানও প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন—সে বল নরনাথের ছিল না। সন্ন্যাসী বা বীরের লক্ষণ তাহাতে স্ফূর্ত্ত হয় নাই।

আর এক কারণ, প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অল্পবয়স্ক ছাত্রকে পড়াইতে হয়—প্রাথমিক শিক্ষার্থী বালকবালিকাকে,—তাহাতে না আছে আনন্দ, না থাকে উৎসাহ। আবার সে কাযে বেতন যেমন সামান্য, মানও তেমনই অল্প। এই সব ভাবিয়াই নরনাথ ছেলে-পড়ানোর সংকল্প পরিত্যাগ করিয়াছিল।

সে কলিকাতায় আসিবার ছয় মাস পরে বিশ্বনাথ একবার আসিলেন। তিনি বলিয়া গেলেন, তাহার যদি কিছু খরচ বেশী দরকার হয়, তাহা তিনি দিতে পারিবেন। যাইবার সময় তিনি কুড়িটি টাকাও দিয়া গেলেন। নরনাথ নিজেও যথেষ্ট সাবধান ছিল। যাহাদের সঙ্গে মিশিতে হইত, তাহাদের সঙ্গে মিশিবার মত পোষাক-পরিচ্ছদ সে পরিত বটে, কিন্তু কিছুতেই বাহুল্যে যাইত না এবং যথাসম্ভব অল্পব্যয়ে চালাইবার চেষ্টা করিত। সে জানিত এবং সর্ব্বদাই মনে করিত—তাহার দায়িত্ব অসাধারণ, তাহাকে পালিত-পরিবারের সম্ভ্রমসৌধের ভগ্ন চূড়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। তাই পাঠে সে কখন অমনোযোগী হইত না। কলেজের পাঠ সারিয়া আসিয়া সে খানিকটা পড়িত—তাহার পরে বেড়াইয়া আসিয়া সন্ধ্যা হইলেই পুনরায় পড়িতে বসিত। ছেলে-মহলে তাহার খ্যাতি ছিল—সে খুব মনোযোগী ছাত্র।

অবনীমোহনের পিতাকে কার্য্যোপলক্ষে মধ্যে-মধ্যে কলিকাতায় আসিতে হইত—আসিলে তিনি প্রায়ই ছেলের মেসে উঠিতেন। আর তিনি যখনই কলিকাতায় আসিতেন, নরনাথের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরিয়া

আলাপ করিতেন এবং তাহার ব্যবহারাদি লক্ষ্য করিতেন। একদিন সন্ধ্যায় বেড়াইয়া ফিরিবার সময় সিঁড়িতে উঠিতে-উঠিতে নরনাথ শুনিতে পাইয়াছিল, মেসের পাচক তাঁহাকে বলিতেছে, "এতগুলি বাবু ত আছেন, নরুবাবুর সমান কেউ নাই—যেমন ঠাণ্ডা মেজাজ, তেমনই সভ্য। মুখে কখনও একটি চড়া কথা নাই; আর শুনিয়াছি—পড়ায় কেহ উঁহার মত নহে—জলপানি পাইয়াছেন, বাবুরা বলাবলি করেন—আবার পাইবেন।"

আত্মপ্রশংসা শুনিতে নরনাথ ভালবাসিত। এমন অনেকেই বাসে। পাচকের কথাগুলি তাহার কাণে যাইতেই তাহার হৃদয় আনন্দে ও গর্ব্বে পূর্ণ হইল—সে মানুষ হইবে, মানুষ হইয়া পালিত-পরিবারের নির্ব্বাপিত গৌরব-শিখা পুনঃ প্রজ্জ্বলিত করিবে।

এইরূপ নানাকথা ভাবিতে-ভাবিতে সে যাইয়া আলোকটি জ্বালিয়া লইয়া পাঠ করিতে বসিল।

সেই রাত্রিতে পুত্রের কক্ষে শয়ন করিতে যাইবার সময় অবনীমোহনের পিতা দেখিয়া গেলেন—নরনাথ তখনও পড়িতেছে; আর ঘরে যাইয়া তিনি দেখিলেন, অবনীমোহন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তিনি মনে-মনে ভাবিলেন নরনাথ কালে বড় হইবেই। তিনি তাহার সম্বন্ধে যত সন্ধান লইতেছিলেন, ততই তাঁহার মনের নিগূঢ় বাসনা প্রবল হইতেছিল। তিনি সময়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। আর ওদিকে নরনাথের পিতার বিরুদ্ধে তাঁহার ডিক্রীর সুদ বাড়িয়া চলিতেছিল। উকিলবাবু দুই-একবার তাঁহাকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টায় জানাইয়াছেন—"ক্রমে যে খরচা ভারী হচ্চে! এর পর আর লাভ থাকবে না।" উত্তরে তিনি কেবল বলিয়াছেন, "না; সম্পত্তিটা দামী।" তাঁহার এই শৈথিল্যের কারণ

জানিতে না পারিয়া লোক বিস্মিত হইত। তবে তুই এক জন লোক বলাবলি করিত—ইহার মধ্যে একটা কিছু আছে। নহিলে এতদিন চুপ করিয়া থাকিবার লোক—তিনি নহেন। কিন্তু ভিতরের কথাটা তিনি খুবই গোপন রাখিয়াছিলেন, এমন কি স্ত্রীপুত্রের কাছেও প্রকাশ করেন নাই; কি জানি যদি জানাজানি হইলে কার্য্যহানি হয়।

তুই বৎসর সমান মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া নরনাথ পরীক্ষা দিল। সে যে পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিবে সে-বিষয়ে তাহার বা তাহার বন্ধুদিগের কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কেবল উৎকণ্ঠা—সে সর্ব্বপ্রথম স্থান পাইবে কি না।

সে ও তাহার বন্ধুবান্ধবেরা যেমন আগ্রহ সহকারে তাহার পরীক্ষাফলের প্রত্যাশা করিতেছিল, অবনীমোহনের পিতাও তেমনই আগ্রহ অনুভব করিতেছিলেন।

অবনীমোহনও পরীক্ষা দিয়াছিল। পুত্রের পরীক্ষার ফল যে বিশেষ সন্তোষজনক হইবে না তাহা পিতা বুঝিয়াছিলেন—কারণ, পুত্রের বুদ্ধির উপর তাঁহার বড় বিশ্বাস ছিল না। তিনি আরও বুঝিয়াছিলেন, পুত্র যদি কোনরূপে পরীক্ষার বৈতরণী পার হয়, সে কেবল নরনাথের আদর্শে ও উপদেশে। শেষে তাঁহার আশাও সফল হইয়াছিল, কোনরকমে অবনীমোহন পাশ করিয়াছিল।

কিন্তু নরনাথের পরীক্ষার ফল জানিতে তাঁহার এই আগ্রহ তাঁহার গৃহিণীর কাছেও বিস্ময়কর বলিয়া মনে হইয়াছিল এবং তিনি বলিয়া

ছিলেন, "তুমি যে দেখি, পালিতদের ছেলেটার জন্যে বড় ব্যস্ত!"

তখন তিনি গৃহিণীর কথায় কোণ উত্তর দেন নাই।

যখন পরীক্ষার ফল বাহির হইল, তখন নরনাথ প্রথম স্থান অধিকার না করিলেও তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে জানিয়া তিনি গৃহিণীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওগো, আমি পালিতদের ছেলেটার পাশের খবর কেন খুঁজছিলাম, তা শুন্‌বে?"

গৃহিণী বলিলেন, "কেন?"

"আমিঠিক করে রেখেছি' শ্রীমতীর সঙ্গে ওর বিয়ে দেব।"

বিপুলাঙ্গী গৃহিণীর মুখে মাংসের আধিক্যে চক্ষু দুইটা ছোট দেখাইত। কথা শুনিয়া সেই চক্ষু দুইটা যেন উজ্জ্বল ও বড় দেখাইতে লাগিল। মেয়েটি পরী নহে—ছাঁচে গড়া রূপ তাহার নাই। এমন মেয়ের যদি অমন বর হয়, তবে তাহা আশারও অতীত!

গৃহিণী বলিলেন, "ছেলেটি শুনেছি দেখতে ও রাজপুত্তুরের মত!"

"ভাল ত সব দিকেই, এখন মেয়ের ভাগ্য।"

"তুমি লোক পাঠিয়ে প্রস্তাব কর।"

কর্ত্তা হাসিয়া বলিলেন, "সোজা আঙ্গুলে কি ঘি উঠে গো? একটু বেগ দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে হবে।"

গৃহিণী আর কিছু বলিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার মনে একটু আশঙ্কা দেখা দিল—বেগ দিয়ে যদিই বা বিয়ে হয়, কিন্তু শেষে জামাইয়ের যদি মেয়েকে মনে না ধরে! মেয়ের রূপের অভাবের জন্য তিনি সর্ব্বদাই লজ্জানুভব করিতেন; লজ্জার বিশেষ কারণ, তিনি জানিতেন, মেয়ে সে ত্রুটীটা তাহার মাতার নিকট হইতেই পাইয়াছে।

গৃহিণী যখন এই সব ভাবিতেছিলেন, কর্ত্তা তখন মনে করিতে-

ছিলেন, কেমন করিয়া—কোন পথে অগ্রসর হইলে—কার্য্যসিদ্ধি হইবে। টাকার চাপ তিনি নরনাথের পিতাকে দিতে পারেন, কিন্তু যাহার হাতে মেয়ে দিবেন—মেয়ের রূপের অভাব জানিয়াও তাহাকে কেবল ভয় দেখাইয়া সম্মত করিলে কি সুফল ফলিবে? ভয় দেখাইতে হইবে—ভয় তাহারা পাইয়াই আছে; কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে শিষ্টাচারের ভাবটুকু দেখাইলে বোধ হয়, সব দিক্ রক্ষা হয়।

তিনি সেই ভাবে অগ্রসর হইবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ঘন-ঘন গোঁফ টানা দেখিয়া গৃহিণী বুঝিলেন, তিনি কোন বিশেষ চিন্তায় মগ্ন। অবশ্য কিসের চিন্তা, গৃহিণী তাহাও অনুমান করিতে পারিলেন।

[৩]

পরীক্ষায় নরনাথের সাফল্যে সেদিন বাড়ীতে সত্যনারায়ণপূজার উদ্যোগ-আয়োজন হইতেছিল। সে-আয়োজনে অগ্রণী তাহার পিতামহী, আর তাঁহার সহকারী তাহার বিমাতা।

নরনাথকে লইয়াই শাশুড়ীবধূতে মনোমালিন্য দূর হইয়া গিয়াছিল। বিমাতা বরাবরই এই ছেলেটির প্রতি স্নেহশীল ছিলেন, কেবল শাশুড়ীর ভয়েই তাহাকে বুকে টানিয়া লইতে পারেন নাই। এখন তিনি আপনাকে তাহার মা বলিয়া মনে করিবার সুযোগ পাইয়া যেন কৃতার্থ হইয়াছেন। আর নরনাথের শ্রেষ্ঠত্বে শাশুড়ীর প্রত্যয় তাঁহাতেও সংক্রামিত হইয়াছে।

অবনীমোহনের পিতা দীননাথের পত্র লইয়া তাঁহার ভৃত্য রহমন আসিয়া ডাকিল, "পালিত মশাই বাড়ী আছেন কি ?"

রহমন দীননাথের গাঁতির খাজনা আদায়ের পেয়াদা এবং বাড়ীর মাইনদার।

শিবনাথ বহির্বাটীতে ছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথা থেকে আসছ ?

"বীরনগরের দীনু ঘোষ মশাইর বাড়ী থেকে। পত্তর আছে।" বলিয়া রহমন চাদরে বাঁধা পত্র বাহির করিতে লাগিল।

শিবনাথের মনে হইল, দীনু ঘোষের বাড়ীর পত্র নিমন্ত্রণপত্র না হইয়া আদালতের নোটীশ হইবার সম্ভাবনাই অধিক। "দেখছি"—বলিয়া সে পিতার সন্ধানে গেল এবং পিতাকে জানাইল, বীরনগরের দীনু ঘোষের বাড়ী হইতে পত্র লইয়া লোক আসিয়াছে।

শুনিয়া বিশ্বনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "পত্র কই ?"

শিবনাথ বলিল, "তা'র কাছেই আছে।"

"লোকটাকে বস্‌তে বলেছিস্ ত ?"

শিবনাথ চুপ করিয়া রহিল।

বিশ্বনাথ ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "বুড়ো ধাড়ী ছেলে, তাও বলনি ? জান না, পাওনাদার গুরুঠাকুরের চেয়েও বড় ? যমের চাইতে বেশী ভয় করতে হয় যমদূতকে, তার হিসেব রাখো ?"

রাগে গরগর করিতে করিতে তিনি বাহিরের দিকে গেলেন।

দীনু ঘোষের লোকের কথা শুনিয়া পিতামহী চমকিয়া উঠিয়াছিলেন। ঠিক আজিকার এই সত্যনারায়ণ-পূজার দিনে! কেন, বিলম্বে কি ক্ষতি হইত ? তিনি সত্যনারায়ণের কথাও ভুলিয়া গেলেন। তিনি ঘরের বাহিরে রোয়াকের উপর আসিয়া স্তব্ধ ও উদ্বিগ্নভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন—দীনু ঘোষের বাড়ীর লোক !

তাঁহার দৃষ্টি দ্বিতলের একটা কক্ষের বাতায়নে পড়িল। সেই বাতায়নে বসিয়া নরনাথ কি একখানা পুস্তক পাঠ করিতেছিল। চঞ্চল জলের উপর তৈলপাতে জল যেমন শান্ত হয়, নরনাথকে দেখিয়া পিতামহীর চঞ্চল হৃদয় তেমনই শান্ত হইল—ভয় কি ?—নরনাথ হইতে সব দুঃখ ঘুচিবে।

তিনি পুনরায় ঘরে যাইয়া পূজার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিশ্বনাথ আসিয়া ডাকিলেন, "মা!"

মা বলিলেন, "কি, বিশু?"

"লোকটা এখনই যেতে চায়; দু'টো চিঁড়ে মুড়কী আর গোটা-দুই রসকরা দাও।"

শাশুড়ী বধূকে বলিলেন, "দাও গে ত, বৌমা!"

বৌমা ঘোমটা টানিয়া ভাঁড়ার ঘরে গেলে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, খবর ভাল ত?"

বিশ্বনাথ বলিলেন, "মন্দ নয়।"—বলিয়া তিনি ডাকিলেন, "নরু!"

"আজ্ঞে যাই"—বলিয়া উপর হইতে উত্তর দিয়া নরনাথ নামিয়া আসিলে তিনি তাহাকে একখানা পত্র দিয়া বলিলেন,—"তোকে এই পত্র লিখেছেন।"

তারপর তিনি চিঁড়ে-মুড়কির জন্য ভাঁড়ার ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

নরনাথকে দীনু ঘোষ পত্র লিখিয়াছে! কৌতূহলে ঠাকুমা অস্থির হইয়া উঠিতেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি লিখেছে রে?"

নরনাথ পত্র পড়িয়া শুনাইল ঃ—

শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপন,

তোমার পাশের সংবাদে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলাম। তুমি আমাদের এ-অঞ্চলের মুখ উজ্জ্বল করিলে; আশা করি, সর্ব্ববিষয়ে

এইরূপ করিয়া আমাদিগকে সুখী করিবে। তোমা হইতে পালিত-বংশ উজ্জ্বল হউক। বোধ হয় শুনিয়াছ—শ্রীমান অবনীমোহন থার্ড ডিভিশনে পাশ হইয়াছে। সে যে তোমার সঙ্গে থাকিয়াই পাশ করিয়াছে, তাহা আমি জানি। দুই একদিন মধ্যে আমি তোমাদের ওদিকে যাইব। অবনীমোহনের সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য সে বিষয়ে সেই সময় তোমার সহিত পরামর্শ করিবার ইচ্ছা রহিল। আশা করি, তোমাদের সব মঙ্গল। ইতি—

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীদীননাথ ঘোষ।

পত্রের উত্তর লিখিতে নরনাথ চলিয়া গেল। ঠাকুমা বৌমাকে বলিলেন, "দেখলে? সবাই ঐ কথা বলে—নরু হ'তে বংশ উজ্জ্বল।"

বৌমা বলিলেন, "তা' ত বটেই।"

নিজ পত্রের উত্তর লিখিয়া বিশ্বনাথ আবার বাড়ীর ভিতরে আসিলেন এবং নরনাথের নিকট যাইয়া তাহার পত্র দেখিলেন।

দীননাথ তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন ঃ—

নমস্কার বিজ্ঞাপন,

মহাশয়ের পুত্রের পাশের সংবাদে সুখী হইয়াছি। চাণক্য পণ্ডিত লিখিয়াছেন ঃ—

'একেনাপি সুবৃক্ষেণ পুষ্পিতেন সুগন্ধিনা।
বাসিতং তদ্বনং সর্ব্বং সুপুত্রেণ কুলং যথা॥'

আপনার এই পুত্র হইতে বংশ উজ্জ্বল হইল—আমাদের এ-অঞ্চলও উজ্জ্বল হইবে। আমার এক পুত্র শ্রীমানের সহিত এক মেসে

কলিকাতায় থাকিয়া লেখাপড়া করে। শ্রীমানের উপদেশে কায করিয়া সেও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মহাশয়েরা এ-অঞ্চলে প্রসিদ্ধ বংশ। তবে লক্ষ্মী চঞ্চলা, সেই জন্য বর্ত্তমানে বিপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু আবার তাঁহার কৃপা হইতে কতক্ষণ? তাহাই বিবেচনা করিয়া এবং আমা হইতে আপনার কোন স্থায়ী অনিষ্ট হইলে আমার অপযশই হইবে বুঝিয়া আমি অদ্যাপি কোন অপ্রিয় কার্য্যে অগ্রসর হই নাই। কিন্তু উকিলবাবুরা পুনঃপুনঃ পত্র লিখিতেছেন; টাকাও ক্রমে বাড়িয়া যাইতেছে। কারণ, ঘোড়ার দৌড় আর স্থুদের দৌড় বাড়িয়াই চলে। এ অবস্থায় যাহাতে আমারও ক্ষতি না হয়, আপনারও অনিষ্ট না হয়, এমন একটা বন্দোবস্ত করিতে পারিলে উভয় দিক্ বজায় থাকে। সে বিষয়ে আমার একটি প্রস্তাবও আছে। দুই এক দিনের মধ্যে আমার একবার ওদিকে যাইবার প্রয়োজন আছে—আপনার আপত্তি না থাকিলে সেই সময় এ বিষয় আলোচনা করিয়া যাইতে পারি। আপনার অনুমতির প্রতীক্ষা। আশা করি, মহাশয়ের কুশল। এই সঙ্গে শ্রীমান্ নরনাথ বাবাজীর জন্যও একখানি পত্র দিলাম।

লোক মারফৎ প্রস্তাবিত বিষয়ে মহাশয়ের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে বাধিত হইব। ইতি—

ভবদীয়—

শ্রীদীননাথ ঘোষ।

পত্রের উত্তরে বিশ্বনাথ এই লিখিয়া দিলেন, ঘোষ মহাশয় যে তাঁহার বাড়ীতে আসিবার কথা লিখিয়াছেন, সে তাঁহার উদারতারই পরিচায়ক। বিশ্বনাথ তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। সাক্ষাতে সকল বিষয়ের আলোচনা হইবে।

যে দিন বিশ্বনাথ পত্র লিখিলেন, তাহার দুইদিন পরেই একদিন মধ্যাহ্ন অতীত না হইতে গ্রামের ঘাটে একখানি পান্সী ভিড়িল। নৌকায় একজন মাত্র আরোহী। তিনি ঘুমাইতেছিলেন। মাঝি ডাকিল, "কর্ত্তা, ঘাটে এসেছি।"

আরোহী দীননাথ উঠিয়া বসিলেন এবং বালসের ও-পাশে রক্ষিত জামাটা গায় দিয়া চাদর খানা ও ছাতিটা লইয়া নৌকার আচ্ছাদনের মধ্য হইতে বাহির হইলেন ও জুতা পরিলেন।

তারপর ধীরে-ধীরে ছাতি মাথায় দিয়া পালিত-বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

পালিতদের বাড়ীটা জীর্ণ—তবে বিশ্বনাথের সতর্ক দৃষ্টি সর্ব্বদা বাড়ীর উপর থাকায় এখনও পড়ে নাই—তিনি যথাসাধ্য সংস্কার করাইয়া থাকেন; তবে তাঁহার সাধ্য বড় বেশী নহে। প্রাচীরঘেরা বাহিরের উঠানে—যে স্থানে পূর্ব্বে বাগানে গাছের কেয়ারী ছিল, তথায় গোটা দুই গাভী দীর্ঘ রজ্জুতে বদ্ধ থাকিয়া তৃণভক্ষণ করিতেছে। দ্বিতলে থামের মাথায় পারাবত বাসা করিয়াছে,—তাহাদের স্ফীত কণ্ঠোত্থিত "বক-বকম" রব শুনা যাইতেছে। দেউড়ীর মধ্যে পূর্ব্বে যে স্থানে পাঁড়ে, তেওয়ারী, মিশির প্রভৃতি থাকিত সেই স্থানেই জোড়া তক্তপোষের উপর সতরঞ্চী বিছানো—বিশ্বনাথ সাধরণতঃ তথায় বসেন। সেকালের স্মৃতিচিহ্ন আছে—দেওয়ালে টাঙ্গানো থান-দুই চামড়ার ঢাল।

আজও বিশ্বনাথ সেই স্থানে বসিয়া একখানি বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্র পাঠ করিতেছিলেন,—পদশব্দ শুনিয়া চাহিয়া দেখিলেন—দীননাথ ঘোষ!

দীননাথ পূর্ব্বেই আসিবার কথা জানাইয়াছিলেন। তবুও তাঁহাকে

সম্মুখে দেখিয়া বিশ্বনাথ একটু অস্বস্তি বোধ করিলেন। কি জানি—তিনি পাওনাদার।

কিন্তু মনের প্রকৃত ভাব গোপন করিয়া বিশ্বনাথ উঠিয়া অতিথিকে সাদরসম্ভাষণ করিলেন,—"আসুন, ঘোষ মশায়! আমার পরম ভাগ্য—আপনার আগমন হ'ল।"

দীননাথ উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "সে কি কথা, পালিত মশাই? আপনারা হলেন এ-অঞ্চলে প্রসিদ্ধ লোক। আমারই ভাগ্য; আজ দর্শনলাভ হ'ল।"

"ওরে! ওরে!" করিয়া বিশ্বনাথ ভৃত্যকে ডাকিতে লাগিলেন। ভৃত্যের অবশ্য বাহুল্য ছিল না। কাযেই সহসা কোন উত্তর পাওয়া গেল না। তাঁহার ব্যস্ত ভাব লক্ষ্য করিয়া দীননাথ বলিলেন, "কেন ডাক্‌ছেন? আমার ত কোন দরকার নেই। আমি তামাক খাই না।"

বাজে খরচে দীননাথের আপত্তির কথা তাঁহার গ্রামে—এমন কি পাশাপাশি গ্রামেও অনেকেরই হাস্য-পরিহাসের বিষয় ছিল।

দীননাথ বলিলেন, "দেখুন, এখন নিরিবিলি আছে—আমারও বেশী সময় নেই, কাযের কথাটা সেরে ফেলা যাক।"

দীননাথ পকেট হইতে কতকগুলা কাগজও চশমা বাহির করিলেন; একখানা কাগজ বিশ্বনাথকে দিয়া বলিলেন, হিসেবটা এই রকম দাঁড়িয়েছে। এর উপর আদালতের খরচ চাপ্‌বে।"

বিশ্বনাথ একবার মোট টাকাটা দেখিয়া বিমর্ষমুখে বলিলেন, "এই রকমই হবে।"

"সে আপনি ত জানেনই। আপনার সঙ্গে কোন রকম অসদ্ভাব করা আমার ইচ্ছা নয়; তা'তে আমার অপযশ ছাড়া যশ হবে না। বিশেষ

আপনার ছোট ছেলেটির গুণে আমি মুগ্ধ। আমার ছেলের সঙ্গে এক মেসে থাকে—ছু'টিতে খুব ভাব। ওরই জন্য আমার ছেলে পাশ হয়েছে। কি ছেলে আপনার—যেমন রূপ, তেমনই গুণ! তা থা'ক—আমার ছেলেও বলে, আপনার কোন অনিষ্ট আমি করতে পারব না। শেষে সবই ত ওদের, আমার আর ক'দিন!"

বিশ্বনাথ কি বলিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না। তিনি কেবল অন্য-মনস্কভাবে বলিলেন, "তা ত বটেই।"

"আমি সেই জন্যই ছু'বৎসর কোন কথা বলিনি।"

বিশ্বনাথ তাহা খুবই জানিতেন। এই ছুই বৎসর মামলামোকর্দ্দমার খরচ না থাকায় তিনি খুচরা দেনা অনেকটা শোধ করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু এমন কিছুই সঞ্চয় করিতে পারেন নাই যে, সেই টাকাটা দিয়া একটা মিটমাটের প্রস্তাব করিবেন। তিনি কি বলিবেন?

দীননাথ তখন বলিলেন, "আর ত দেরীও করা চলে না! আইনে দোষ হ'তে পারে। যদি আপনি অর্দ্ধেক টাকাটা ও দিয়ে দেন, বাকিটা আমি একটা সোলে কিস্তিবন্দী করে নিতে পারি। বোধ করি, তাতে আপনার অসুবিধা হবে না।"

বিশ্বনাথ বলিলেন, "কিন্তু এখনই—অত টাকা ত যোগাড়—"

"দেখুন আর একটা উপায় আছে। তা'তে আপনারও কষ্ট হয়না, আমারও পরম আনন্দ হয়। যদি অভয় দেন, তবে সে কথাটা বলি।"

সে কি প্রস্তাব জানিবার জন্য বিশ্বনাথ বিষম কৌতুহল অনুভব করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, "বলুন—বলুন।"

দীননাথ বলিলেন, "যদি নরনাথের জন্য আমার মেয়েটিকে গ্রহণ করেন।"

এ প্রস্তাব বিশ্বনাথ আশা করেন নাই—কল্পনাও করেন নাই। তিনি বলিলেন, "আমার মাঠাকরুণ আছেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে হয়।"

"সেত বটেই! তিনি অনুমতি না দিলে কি কায হ'তে পারে? আমি আজ ব'লে গেলাম, হপ্তাখানেকের মধ্যে খবর দেবেন। আগামী হপ্তায় আমাকে একবার সদরে যেতে হবে, তার আগে জানতে পারলে বড়ই ভাল হয়।"

"আচ্ছা তাই হবে।"

"নরনাথ কোথায়? বাড়ীতে আছে?"

"আছে—সে ত কোথাও বড় বেরোয় না; পড়া নিয়েই থাকে।"

"বড় ভাল ছেলেটি, একবার ডাকলে দেখে যাই।"

বিশ্বনাথ যাইয়া নরনাথকে ডাকিয়া আনিলেন।

নরনাথ আসিয়া প্রণাম করিলে দীননাথ বলিলেন, "এস বাবা! বড় খুসী হয়েছি—আমি বরাবর জানতাম, তুমি ভাল হয়ে পাশ হবেই। আমাদেরও মুখ উজ্জ্বল কিনা!...কবে কল্‌কাতায় যেতে হবে?"

নরনাথ পিতার দিকে চাহিয়া বলিল, "বাবা এখনও দিন ঠিক করেন নি।"

"তা' যাবার আগে একটা খবর পেলে অবনীও তোমার সঙ্গেই যাবে। আজই সে সঙ্গে আসতে চেয়েছিল, তা' আমিই আনলাম না।—কাজের কথা ছিল কি না!"——

দীননাথ তখনই যাইতে উদ্যত হইলেন। বিশ্বনাথ বলিলেন, রাত্রিতে আহার করিয়া যাইতে হইবে। শেষে রফা বন্দোবস্তে কিছু জলযোগ

করিয়া দীননাথ যাত্রা করিলেন। বিশ্বনাথ ঘাট পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে যাইবার আয়োজন করিলে তিনি জিদ্ করিয়া নিবারণ করিলেন, এমন কি তিনি নরনাথকে ও সঙ্গে আসিতে দিলেন না।

দীননাথ বিদায় লইয়া গেলে বিশ্বনাথ তামাক সাজিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন আর ভাবিতে লাগিলেন। উপায়টি মন্দ বলিয়া মনে হইল না। আর মন্দ হইলেই বা করিবেন কি? ডুবিতে ডুবিতে যদি বাঁচিবার উপায় হয়, তবে ভাসমান কাষ্ঠখণ্ড বৃষকাষ্ঠ কি চন্দনতরুর শাখা, সে বিচার করা চলে না।

হুঁকাটা রাখিয়া বিশ্বনাথ বাটীর মধ্যে গেলেন এবং ডাকিলেন—"মা!"

মা তখন ভাঁড়ারে ছিলেন। "কি বাবা?"—বলিয়া তিনি বাহিরে আসিলেন।

বিশ্বনাথ বলিলেন, "একটা কথা আছে।"

"তুমি ঘরে যাও, আমি এখনই যাচ্ছি।"

"এখানেই বসি"—বলিয়া বিশ্বনাথ রোয়াকের উপর বসিবার আয়োজন করিলে মা তাড়াতাড়ি একখানা আসন আনিয়া পাতিয়া দিলেন।

বসিয়া বিশ্বনাথ বলিলেন, "দীনুঘোষ এসেছিল।"

মা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "তা'ত শুনলাম।"

"দু' বছর চুপ করে ছিল; কিন্তু আর থাকে না।"

"সবই আমার অদৃষ্ট।"

"মনে করেছিলাম ছেলেরা মানুষ হ'লে যা' হ'ক একটা উপায় করতে পারব। তা'ত দেখলে। এখন ভরসার মধ্যে নরু; কিন্তু সে এখন কি করবে?"

মা আর কি উত্তর করিবেন? নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

"কিন্তু এখন দেখছি, উপায় নরুই করতে পারে।"

মা কৌতুহলপূর্ণ দৃষ্টি পুত্রের মুখে ন্যস্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করতে পারে, বিশু?"

"দীনুঘোষ ওর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চায়। সে কল্‌কাতায় ক'বার ওকে দেখেছে···ওর খুব প্রশংসা করে; ওকে মেয়ে দিয়ে সব পাওনা ছেড়ে দিতে রাজি আছে।"

উপায়টা যে খুব প্রলোভনীয়, তাহাতে সন্দেহ না থাকিলেও মা এক কথায় সে প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইলেন না। তিনি বলিলেন, মেয়ে কেমন?"

বিশ্বনাথ বলিলেন, "তা' আমি জানিনে; তবে,—বোধহয় দেখতে ভাল হবে না।"

মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা না করিয়া মা বলিলেন, তবে আমি ওখানে বিয়ে দেব না।"

মা'র যে এই আপত্তি হইবে, বিশ্বনাথ তাহা পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলেন। মা নিজে অসামান্য, সুন্দরী ছিলেন—এই বয়স, এত কষ্ট, অবস্থার এই বিপর্য্যয়—তবুও মা'র কাঁচা সোনার মত রং মলিন হয় নাই, জরাও তাঁহার সুগঠন নষ্ট করিতে পারে নাই। পুত্রবধূ বাছিবার সময়ও তিনি কম যত্ন করেন নাই। সেই পুত্রবধূই বিশ্বনাথের পুত্রদিগের জননী। সে সবই সত্য; কিন্তু উপায় কি?

বিশ্বনাথ বলিলেন, "তা' ত তুমি বললে, কিন্তু—"

এই কিন্তুটা যে কত বিষম, তাহা মাও জানিতেন। তিনি বলিলেন, "তা বুঝি বাবা। তবু নরুর আমার কাল-কুশ্রী বৌ—সে যে মনেও করতে পারিনে!"

বিশ্বনাথ চুপ করিয়া রহিলেন।

মা একটু ভাবিয়া বলিলেন, "শুনেছি, আজকাল ছেলের বিয়েতে লোক খুব বেশী টাকা নেয়। যদি তাই হয়, তবে না হয় আর-কোথাও নরুর বিয়ে দাও—টাকাটা দীনু ঘোষকে দিয়ে দিলেই হবে।"

"সে হ'বে না, মা। যা'রা বেশী টাকা দেবে, তা'রা কেবল ছেলে দেখে দেবে না। পাড়াগাঁয়ে বাস—বলতে গেলে কিছুই নেই—এমন ছেলে হীরের টুকরো হ'লেও কেউ বেশী টাকা দেয় না।"

মা নিরুত্তর হইলেন।

বিশ্বনাথ উঠিয়া গেলেন। তাঁহার বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া মা'র বুকের মধ্যে কর-কর করিয়া উঠিল।

শিবনাথের কাছে নরনাথ সব কথা শুনিল। বিশ্বনাথ যখন তাঁহার মাতাকে দীনু ঘোষের প্রস্তাব জানাইতেছিলেন, শিবনাথের স্ত্রী তখন পার্শ্বের ঘরে ছিল। সে স্বামীকে সব কথা জানাইল।

পরদিন প্রভাতে শিবনাথ নরনাথের ঘরে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "নরু, দীনু ঘোষ কাল তোমাকে কি বল্‌লে?"

নরনাথ উত্তর দিল, "কবে কলকাতায় যাব, তাই জিজ্ঞাসা করলেন।"

"কেন এসেছিল, কিছু শুনেছ?"

"না।"

"তোমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবার প্রস্তাব করতে এসেছিল। বলেছে, তা'হলে সব পাওনা ছেড়ে দেবে।"

নরনাথ কোন কথা না বলিয়া জ্যেষ্ঠের দিকে চাহিল।

শিবনাথ বলিল, "বাবা ঠাকুরমা'কে এ কথা জানিয়েছেন। বাবার ইচ্ছা—কোন রকমে ভিটে ও গাঁতিটা রক্ষা করা। ঠাকুরমা কিন্তু একেবারেই অসম্মত, বলেছেন—মেয়ে সুন্দরী না হ'লে তিনি কিছুতেই তোমার বিয়ে দেবেন না। এখন ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে, এক দিকে যেমন-তেমন মেয়ে, আর এক দিকে সর্ব্বনাশ।"

নরনাথ কোন কথা বলিল না দেখিয়া শিবনাথ চলিয়া গেল।

নরনাথ ভাবিতে লাগিল। বাবার ইচ্ছা—কোন রকমে ভিটে ও গাঁতিটা রক্ষা করেন। দাদা বলিলেন—এখন ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে, এক দিকে যেমন-তেমন মেয়ে, আর একদিকে সর্ব্বনাশ! সে এখন কি করিবে? অবনীমোহনের ভগিনী—সুন্দরী হইবে, এমন আশা নাই। তাহাকে লইয়াই জীবন কাটাইতে হইবে। আর এক দিকে? পিতাকে চিন্তামুক্ত ও ঋণমুক্ত করা এবং পালিত-পরিবারের সৌভাগ্য-সৌধের জীর্ণ সংস্কার করিবার যে ভার তাহার, তাহাই বহন করা। লোক তাহার প্রশংসাই করিবে—বাপের জন্য ত্যাগস্বীকার করিল। কিন্তু এ ত্যাগ,—এ যে কত বড় ত্যাগ, তাহা উচ্চাকাঙ্ক্ষাশালী যুবক ব্যতীত আর কে বুঝিতে পারিবে?

অপরাহ্ণে মা যখন তাহার জন্য জলখাবার লইয়া আসিলেন, নরনাথ তখন একটা ষ্টোভ্ জ্বালাইয়া চা'র জল গরম করিতেছিল। মা বলিলেন, "বাবা, তোমার খাবার এই দিয়ে গেলাম।"

তিনি টেবেলখানার উপর খাবারের রেকাবী রাখিবার পূর্ব্বেই নরনাথ বলিল, "ঠাকুরমা কোথায়, মা?"

মা বলিলেন, "ভাঁড়ার ঘরে।"

"আপনি যদি খাবারটা সেখানেই রাখেন! আমি চা তৈরী ক'রে নিয়ে সেখানে যাচ্ছি। তাঁ'র সঙ্গে একটা কথা আছে।"

"না হয় মা'কেই পাঠিয়ে দিই গে।"

"না—না। তাঁকে আর আস্‌তে হ'বে না। আমিই যাচ্ছি।"

মা খাবারের রেকাবী ও জলের গেলাস লইয়া নামিয়া গেলেন।

চা'র বাটী লইয়া নরনাথ যখন ঠাকুরমার কাছে গেল, তখন মা রোয়াকের উপর খানিকটা যায়গায় জল-হাত বুলাইয়া তথায় আসন পাতিয়া খাবার রাখিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। বসিয়া চা'র বাটীটা রেকাবীর পাশে রাখিয়া নরনাথ ডাকিল, "ঠাকমা!"

ঠাকুরমা বাহির হইয়া আসিলেন।

নরনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকমা, বাবা কাল তোমাদের কি বলেছেন?"

ঠাকুরমা বলিলেন, "দীনু ঘোষ এসেছিল।" বলিয়া তিনি চুপ করিলেন।

নরনাথ বলিল, "সে ত আমি জানি—আমাকে ডেকেও তিনি জিজ্ঞাসা ক'রে গেছেন—কবে আমি কল্‌কাতায় যা'ব।"

"সে তোর সঙ্গে তা'র মেয়ের বিয়ে দিতে চায়।"

"বাবা কি বলেছেন?"

"সে এখনও কোন কথা বলেনি—আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল।"

"তুমি তা'তে কি বললে, ঠাকমা?"

"মেয়ে শুনেছি দেখতে ভাল নয়। আমি বলেছি, আমি সুন্দরী মেয়ে নইলে তোর বিয়ে দেব না।"

নরনাথ একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "দীনু ঘোষ যদি দেনার দায়ে আমাদের সর্ব্বস্ব গ্রাস করে, তবে সুন্দরী মেয়ে এনে তুমি কোথায় রাখবে, ঠাকমা?"

"ছেলের বিয়ে না দিলে ত জাত যায় না। আমি এখন তোর বিয়ে দেব না। না হয়—আর দু'বছর পরে তুই 'মানুষ' হ'লে দেব।"

"কিন্তু দীনুবাবু যদি দু'বছর সবুর না করেন, তবে কি হ'বে?"

ইহার উত্তর কি দিবেন, ঠাকুরমা ভাবিয়া পাইলেন না।

মা বলিলেন, "দু'বছর কি কোন রকমে কাটাতে পারা যাবে না?"

নরনাথ বলিল; "না, মা।"

মা নিরুত্তর হইলেন।

নরনাথ বলিল, "তাছাড়া আরও দু'বছর বাবাকে এই ভাবনা ভাবতে হ'বে ত? দেখছ না, তাঁ'র শরীর ভেঙ্গে আস্‌ছে?"

ঠাকুরমার নয়ন অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল; মা'র মুখ ম্লান হইল।

নরনাথ বলিল, "ঠাকমা, তুমি বাবাকে বলো, তিনি যদি ভাল মনে করেন, তোমরা এ-বিয়েতে কোন আপত্তি কোরো না।"

ঠাকুরমা'র চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। ধরা-গলায় তিনি বলিলেন, "এও আমার অদৃষ্টে ছিল—টাকার জন্য তোর কাল বৌ কর্‌তে হ'বে!"

কাল-বৌ করিতে যে নরনাথের আগ্রহ ছিল বা আপত্তি ছিল না, তাহাও নহে। কিন্তু সে বুঝিয়াছিল, সে এই বিবাহে সম্মতি দিলে অনেক ঝঞ্ঝাট শেষ হইয়া যাইবে এবং তাহার প্রশংসা লোকের

মুখে আর ধরিবে না—ঠিক যেন এক তুরুপে টেক্কা মারিয়া "বোম্" ধরা যাইবে।

সে বলিল, "ঠাকমা, তুমি দুঃখ কোরো না। বাবার শরীরের দিকে চেয়ে দেখ।"

ঠাকুরমা আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না—নরনাথের এই ত্যাগের প্রশংসায় তাঁহার হৃদয় কাণায়-কাণায় ভরিয়া গেল এবং তাঁহার দুই চক্ষু ছাপাইয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। মা'র চক্ষুও শুষ্ক রহিল না। তিনি মনে করিলেন, ধন্য তাঁহার সপত্নী—নরনাথের মত পুত্র গর্ভে ধরিয়াছিলেন।

ততক্ষণে নরনাথের আহার শেষ হইয়াছে—সে উঠিয়া চলিয়া গেল।

নরনাথের কাল-বৌ করিতে ঠাকুরমা'র প্রথমে যে প্রবল আপত্তি ছিল, তাহা দুর্ব্বল হইয়া আসিল। প্রথমে পুত্রের কথায় তাহার বলক্ষয় হইয়াছিল, এবার পৌত্রের কথায় তাহা ক্ষীণ হইয়া আসিল। বৌ কাল—কিন্তু বাঙ্গালীর ঘরে কয়টা মেয়ে গৌরবর্ণ হয়? শ্যাম, উজ্জ্বল শ্যাম—এই ত অধিক। আর কাল হইলেও সে যৌতুক হিসাবে কি আনিতেছে? প্রায় বিশ বৎসরের দুর্ভাবনার শেষ—বিশ্বনাথ এবার নিশ্চিন্ত হইবে, আজ বিশ বৎসর যে-আগুন মাথায় লইয়া পুত্র কাল কাটাইয়াছে, সে আগুনে জল পড়িবে; নরনাথ নিরুদ্বেগে পড়াশুনা করিতে পারিবে—তাহার উন্নতির পথে আর কোন বিঘ্ন না থাকিলে, তাহার পক্ষে কোন উচ্চপদ লাভ করা অসম্ভব হইবে না; আর শিবনাথ ও হরনাথ বলে, অকূল সমুদ্র দেখিয়াই তাহারা ভয়ে আড়ষ্ট হইয়াছে—এবার তাহারাও কাযকর্ম্মে মন দিতে পারিবে। সকল দিকেই যদি সুরাহা

হয়,, তবে পালিত-পরিবারের নষ্ট সমৃদ্ধি আবার ফিরিতে কতক্ষণ? যাহার সঙ্গে সেই সমৃদ্ধি ফিরিয়া আসিবে, হউক না সে কাল—সে কাল যে আলো-করা হইবে! নরনাথের বৌ সুন্দরী হইলেই তাঁহার মনের মত হইত সন্দেহ নাই; কিন্তু যদি না-ই হয়, তবে কি তিনি তাহাকে ভালবাসিবেন না? বাসিবেন বই-কি।

তখনই বিশ্বনাথকে ডাকিয়া ঠাকুরমা বলিলেন, "নরু ব'লে গেল, তোমার যখন ইচ্ছা—আর যখন সব হাঙ্গামাও চুক্‌বে, তখন সে ঐ মেয়েই বিয়ে করবে।"

"অ্যাঁ!"—বলিয়া বিশ্বনাথ বিস্মিতভাবে মা'র দিকে চাহিলেন। তাঁহার মনের বিস্ময় ও আনন্দ দৃষ্টিপথে যতটা বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছিল, চক্ষুতে ততটা স্থান ছিল না।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "নরু কি বল্‌লে?"

ঠাকুরমা বলিলেন, "আমাকে আর বৌমাকে বল্লে, 'তোমরা কেন বাবার কথায় আপত্তি কর্‌লে? ভেবে-ভেবে তাঁ'র শরীর নষ্ট হয়ে যাচ্ছে; আর উপায়ও ত দেখা যাচ্ছে না। তিনি যা' ভাল মনে করেন, তাই হ'বে। তোমরা আপত্তি কোরো না।' অমন ছেলে কি আর হয়, বাবা?

স্বস্তির শ্বাস ফেলিয়া বিশ্বনাথ বলিলেন, "তা' বটে। তবে আমি দীনু ঘোষকে চিঠি লিখে দিই?"

"স্বচ্ছন্দে।"

বিশ্বনাথ চলিয়া গেলেন।

পিতামহীর ও বিমাতার প্রশংসমান দৃষ্টি দেখিয়াই নরনাথ বুঝিয়াছিল, তাহার এই কার্য্যে সকলেই তাহার প্রশংসা করিবে। তাহাই সে চাহিতেছিল।

বিশ্বনাথ দীননাথকে পত্র লিখিবার পর কথাটা সাধারণের মধ্যে প্রকাশ হইয়া পড়িল। কেহ বলিল, "দীনু ঘোষ খুব চাল দিয়াছে।"—কেহ বলিল; "যাই বল, কিন্তু পালিত মশাই খুব বেঁচে গেছেন।"

অবশ্য সকলেই একবাক্যে নরনাথের প্রশংসা করিতে লাগিল।

ইহার পর দীননাথ একদিন পালিত মহাশয়ের কাছে আসিলেন। শিবনাথের বিবাহ হইয়া গিয়াছিল; হরনাথের হয় নাই। অবশ্য বাঙ্গালীর ছেলের অন্নের অভাব থাকিলেও ক'নের অভাব হয় না; তাই কোন কোন স্থান হইতে তাহারও বিবাহের সম্বন্ধ আসিতেছিল। তবে এতদিন বিশ্বনাথ সে-বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ করেন নাই। এবার তিনি উদ্যোগী হইলেন। কথা হইল—মধ্যম ভ্রাতার বিবাহের পর অগ্রহায়ণে নরনাথের বিবাহ হইবে; তত দিনে তাহার "জোড় বছরও" কাটিয়া যাইবে।

তাহার পর নরনাথ কলিকাতায় গেল; অবনীমোহনও গেল।

অবনীমোহনের ভগিনীর সহিত নরনাথের বিবাহ স্থির হইয়াছে—এ সংবাদ যখন মেসে ছেলেমহলে প্রচারিত হইল, তখন ছেলেমহলে একটা আন্দোলন দেখা দিল—"মেয়েটা যদি অবনীর মত হয়, তবেই ত চমৎকার। কি দুর্ভাগ্য নরনাথের!" কেহ কেহ আবার বলিল, "কেন, কালো মেয়ের কি বিয়ে হয় না? নরনাথ বেশ করেছে—ওর moral courage আছে।"

---

[৫]

আষাঢ় মাসে নরনাথ বাড়ী আসিল—মেজদাদার বিবাহ।—পূজার ছুটীতে বাড়ী আসিয়া সে দেখিয়া গেল, তাহার বিবাহের আয়োজন হইতেছে। অনেক দিন পরে বিশ্বনাথ বাড়ীটা কতকটা ঝাড়িয়া মেরামত করিতেছেন। আর সে লক্ষ্য করিল—বিশ্বনাথের মুখে হাসি! পিতাকে সে অনেক দিন প্রফুল্ল দেখে নাই। 'ভবিতব্য' বলিয়া পিতামহী অনিচ্ছায় যে বিবাহপ্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছিলেন, এখন তিনিও তাহাতে আগ্রহ দেখাইলেন। কেন না, কোন কাজ হইবেই জানিলে লোকের তাহাতে আপত্তি ক্রমে দূর হইয়া যায়।

অগ্রহায়ণ মাসে নরনাথের বিবাহ হইল। তখন কলেজের ছুটী নাই। তাই বিবাহের তিনদিন মাত্র পূর্ব্বে নরনাথ বাড়ী আসিল এবং চারিদিন পরে বৌভাত হইলেই চলিয়া গেল। বৌ তাহার পছন্দ হইয়াছে কি না, তাহা জানিবার চেষ্টা যাঁহারা করিলেন, তাঁহাদিগের কথায় সে কেবল একটু হাসিল। বিশ্বনাথ বলিলেন, "রূপ বল—যৌবন বল, ক'দিনের জন্য? গুণই সব।"

যাহা হউক নরনাথ কলিকাতায় ফিরিয়া যাইয়া যথারীতি পাঠে মনোনিবেশ করিল।

আর শ্রীমতী?

নরনাথের সহিত তাহার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হওয়া পর্য্যন্ত সে কেবলই শুনিয়া আসিয়াছে—"মেয়ে শিবপূজা করেছিল বটে! অনেক তপস্যা নইলে অমন বর হয় না।" এই কথা সে যতই শুনিত, তাহার কৌতূহল ততই উদ্দীপ্ত হইত। একথা শুনিবার পূর্ব্বেও সে বহুবার অবনী-মোহনের কাছে নরনাথের প্রশংসা শুনিয়াছে—পিতার মুখেও শুনিয়াছে। অবনীমোহনের কাছে নরনাথ যেন সর্ব্ববিষয়ে আদর্শ ছিল। সে কেবলই বলিত, "অমন ছেলে আর হয় না।" পিতার ভাবটাও সেইরূপ ছিল।

দাদার কাছে, বাবার কাছে লোকের কাছে, শ্রীমতী নরনাথের কথা শুনিত। সে তখন একটু বড়ও হইয়াছে—নিতান্ত বালিকাটি নহে। সে নরনাথের সম্বন্ধে কত কল্পনাই করিত। "শুভদৃষ্টির" সময় যখন সে কৌতূহলবশে লজ্জানত নেত্র তুলিয়া স্বামীকে দেখিল, তখন সে যেন কেমন আত্মহারা হইয়া গেল—বাস্তব যে কল্পনাকেও অনায়াসে পরাভূত করিয়াছে! এত রূপ! এ ত সে কল্পনাও করিতে পারে নাই! সেই এক দৃষ্টিতেই সে আপনাকে সর্ব্বতোভাবে স্বামীর পদে অর্পণ করিল; আপনার সৌভাগ্যগর্ব্বে সে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহার চক্ষুতে তাহার তরুণ হৃদয়ের অনাবিল আকুল প্রেমের যে মাধুরী ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা যেন তাহার রূপের অভাবকে ঢাকিয়া নরনাথের কাছে তাহার এক নূতন সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিয়াছিল।

তাহার পর সে শ্বশুর-বাড়ী আসিল। ফুলশয্যার রাত্রিতে সে কিছু-

তেই ঘুমাইল না—কখন নরনাথ ঘুমাইবে। নরনাথ ঘুমাইতেছে মনে করিয়া সে ধীরে-ধীরে উঠিয়া বসিল; মুগ্ধনেত্রে স্বামীর মুখ দেখিতে লাগিল—যেন সে সৌন্দর্য্যসুধা পান করিয়া বিভোর হইল! দেখিয়া আশা যেন মিটে না! এ যে ফুরাইবার নহে! সহসা নরনাথ চক্ষু মেলিল; হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি দেখ্‌ছ?"

লজ্জায় শ্রীমতীর মাথা নামিয়া আসিল—সে যে বলিল, "তোমাকে," সে কথাটা মুখ দিয়া যেন বাহির হইল না। সে তাড়াতাড়ি স্বামীর বুকেই মুখ লুকাইল।

নরনাথ মনে-মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, স্ত্রীর প্রতি খালি কর্ত্তব্যই পালন করিবে। কিন্তু শ্রীমতীর এই ভাব, তাহার আকস্মিক স্পর্শের এই মাদকতা সবল সুস্থ যুবকের মনে কর্ত্তব্যের উপর আর একটি আকর্ষণকে স্থাপিত করিল। সে স্ত্রীকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া তাহার মুখচুম্বন করিল। শ্রীমতীর লজ্জাসঙ্কোচ সব সেই স্পর্শে ভাসিয়া গেল—রহিল কেবল তরুণীর হৃদয়ের প্রবল প্রেম—প্রিয়তমকে পাইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা! সে স্বামীর মুখ পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিয়াও যেন কিছুতেই তৃপ্ত হইতে পারিল না। শেষে শারীরিক অবসাদে সে স্বামীর বুকে মুখ লুকাইল।

তাহার পরদিন "বৌভাত" এবং সেই দিন রাত্রিকালেই নরনাথ কলিকাতায় চলিয়া গেল। অবনীমোহনও "বৌভাতে" এ-বাড়ীতে আসিয়াছিল—উভয়ে একসঙ্গেই যাত্রা করিল।

তাহার পরের দিনটা ভাল ছিল না—তাহার পরদিন দীননাথ আসিয়া কন্যাকে লইয়া গেলেন।

মিলনরাত্রির সুখের স্মৃতি জপমালা করিয়া শ্রীমতী পিত্রালয়ে ফিরিয়া

গেল। তাহার মুখে—চক্ষুতে—কথায়—হাসিতে—ব্যবহারে—তন্ময়তায় তাহার মনের আনন্দ ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল।

শ্রীমতী আপনাকে পরম ভাগ্যবতী বলিয়া বিবেচনা করিল। 'চমৎকার বর!' সকলের কাছেই সে এই কথা শুনিতে লাগিল। বাড়ীর বাসনমাজা দাসী হাবার-মা হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণপাড়ার বামুন-পিসী পর্য্যন্ত সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিল—"জামাই হয়েছে বটে।"

কিন্তু শ্রীমতীর পরিপূর্ণ সন্তোষের মধ্যে একদিন একটু সন্দেহপাত হইল, যেন বসন্তের নীল আকাশে সহসা একখানা মেঘ দেখা দিল। সে দিন সে জনৈকা আত্মীয়ার সহিত তাহার মা'র কথোপকথন শুনিতে পাইল—"হ্যাঁগা, বিয়েতে মোট কত খরচ হ'ল ?,

মা বলিলেন, "ধরতে গেলে দশ হাজারের উপর। বেহাইকে টাকা ধার দেওয়া ছিল, সে দশ হাজারের উপরই দাঁড়িয়েছিল। সেটা ছেড়ে দেওয়া হ'ল।"

"তাই ত বলি—মেয়ে ত আমাদের তেমন নয়, পালিত ঝুঁক্‌লে কেন ? দশ হাজার টাকা কি সোজা কথা !···ছেলেরা কিছু বল্‌লে না ?"

"উনি নিজে সম্বন্ধ করেছেন, তা'রা আবার কি বলবে ? আমার অবনী ত এই সম্বন্ধের জন্যই পাগল।"

শ্রীমতী ভাবিল, তবে বাবা তাহার রূপের অভাব টাকা দিয়া পুরাইয়া দিয়াছেন! তাহার চক্ষুতে জল আসিল। কিন্তু তখই তাহার মনের মধ্যে সযত্নে রক্ষিত স্বামীর আদরের স্মৃতি তাহার মনে পড়িল। সে আদর ত তাহাকেই,—সে ত তাহার পিতার টাকাতে নহে। সে আশ্বস্ত হইল।

কলিকাতায় যাইয়া নরনাথ পাঠে মন দি[illegible] সে জোর করিয়া

মনে করিত, পালিত-পরিবারের ভগ্ন চূড়া আবার গাঁথিয়া তুলিবার ভার তাহার উপর। এখন আবার সে বিবাহিত। আপনার কর্ত্তব্য সে খুব গুরু বলিয়াই বিবেচনা করিত। সে-কর্ত্তব্য পালন করিতে সে কৃতসঙ্কল্প। এবার সে পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারে নাই—আগামী পরীক্ষায় তাহাকে সে-স্থান অধিকার করিতেই হইবে। অন্য ছেলেরা বলিত, "নরনাথ, তুমি যে 'কলেজ না খুলতেই পরীক্ষার পড়া পড়তে আরম্ভ করলে! আমরা ত অনেকে এখনও বই কিনি নি! যা'রা কিনেছে, তা'রাও পাতা কাটেনি।" কিন্তু অবনীমোহন তাহার এই অধ্যয়নস্পৃহায় তাহার প্রতি শ্রদ্ধায় নত হইয়া পড়িত। সে নরনাথের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিত। অন্য ছেলেরা তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিত, "নরনাথ পড়ে, বুঝতে পারি—সকলের উপর হ'বে ব'লে। তুই গাধা, এখন থেকে পড়ছিস কেন? ভগিনীপতির দেখাদেখি কায করা তোর ভগিনীর পক্ষে শোভা পায়, তোকে কখনই মানায় না।"

এই পাঠে একাগ্রতার মধ্যে নরনাথ স্ত্রীকে পত্রাদি লিখিত না। সেকালে যাহাই থাকিয়া থাকুক না কেন, একালে বিবাহিত তরুণ-তরুণীর মধ্যে পত্রব্যবহার এত স্বাভাবিক যে, সে নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়ায় শ্রীমতীর সমবয়সীরা যখন বিস্ময় প্রকাশ করিত, তখন শ্রীমতীর মনে সন্দেহ দেখা দিত···বাবার টাকা!—সে যেন লজ্জায় মরিয়া যাইত। সে জোর করিয়া মনে করিতে চাহিত—তাহা নহে। কিন্তু—কিন্তু—! আবার সন্দেহ দেখা দিত।

সব সন্দেহ দূর হইয়া গেল যখন পূজার ছুটীতে নরনাথ বাড়ী আসিল এবং নিমন্ত্রিত হইয়া শ্বশুরবাড়ী আসিল।

স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্য সে পালন করিবে, এ সঙ্কল্প নরনাথের ছিল।

কাযেই স্বামীর ব্যবহারে শ্রীমতী কোন ত্রুটী দেখিতে পাইল না। এক দিন সে তাহার সন্দেহভঞ্জনের জন্য স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "এতদিনের মধ্যে কি একখানা পত্রও দিতে নেই ?"

নরনাথ উত্তরে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার পত্র পেতে ইচ্ছা করে ?'

দৃষ্টি লজ্জায় নত করিয়া শ্রীমতী উত্তর করিল, "তা' আর করে না !"

"আমি মনে করেছিলাম, অবনীর চিঠিতে তুমি ত আমার খবর পাও—তাই আর লিখিনি। কিন্তু তোমার যখন পত্র পেতে ইচ্ছা করে, তখন এবার আর ভুল হ'বে না।"

শ্রীমতী পত্র লিখিবার মত লেখাপড়া জানে কি না, সে সন্ধানও নরনাথ এত দিন লয় নাই। সে ত কোন সংবাদ লওয়াই প্রয়োজন মনে না করিয়া বিবাহে সম্মতি দিয়াছিল। কিন্তু এবার আসিয়া এবং শ্বশুরালয়ে তিনদিন বাস করিয়া সে বুঝিয়াছে, শ্রীমতী ততটুকু লেখাপড়া জানে—উপন্যাস এবং মাসিকপত্রও পড়িয়া থাকে।

তিন দিন পরে নরনাথ যখন গৃহে ফিরিয়া গেল, তখন সেই তিন দিনের স্মৃতি ছাড়া শ্রীমতীর যেন আর কিছুই ভাল লাগিল না। নরনাথের প্রতি কথা, প্রতি ভাব, মুখের হাসি ও চোখের চাহনি সে যেন স্মৃতিপটে অঙ্কিত করিয়া লইয়াছিল—যখন-তখন তাহা দেখিত। তাই কয়দিন পরে যখন তাহার শ্বশুরবাড়ী যাইবার প্রস্তাব আসিল, তখন সে কিছুতেই মনের কোণে কোথাও কোনরূপ দুঃখ খুঁজিয়া পাইল না।

তাড়াতাড়ি বৌ আনিবার আগ্রহ বিশ্বনাথের ছিল না। নরনাথ তাঁহার আশার সম্বল—শিবরাত্রির সলিতা। কি জানি, স্ত্রীরআকর্ষণে যদি পাঠে তাহার মনোযোগ বিচলিত হয়! কিন্তু তাঁহার মা জিদ করিলেন, "সে কি হয়? যা'দের বিয়ের পর এক বছর বৌ আন্‌তে নেই, তা'দের কথা আলাদা। আমাদের যখন সে নিয়ম নেই, তখন বৌ না আনলে লোকে নিন্দা করবে; বলবে বিয়ে দিয়ে কাজ সিদ্ধ ক'রে নিয়েছে—আর খোঁজ করে না। ছেলেও বড়, বৌও ছেলেমানুষ নয়। না আনলে ভাল দেখায় না।"

অন্য হিসাবে ভাল লাগালাগির কথায় বিশ্বনাথ বিচলিত হইতেন কি না সন্দেহ; কিন্তু একটা কথা ছিল—লোকে বলিবে, তিনি ছেলের বিবাহ দিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া লইয়াছেন। যে-স্থানে সত্য নিষ্ঠুর, সে-স্থানে মানুষ তাহাকে গোপন করিতে, চেষ্টা করে। তাই বিশ্বনাথ বৈবাহিককে পত্র লিখিলেন, নরনাথ এবার কলিকাতায় যাইলে বড়দিনের ছুটীর পূর্ব্বে আর বাড়ী আসিতে পারিবে না, তাই তাঁহার ইচ্ছা, বধূমাতা আসিয়া যে-কয় দিন নরনাথ বাড়ী থাকে, সে-কয়দিন এবাড়ীতে থাকেন। তাহার পর ভাল দিন দেখিয়া তিনি পাঠাইয়া দিতেও আপত্তি করিবেন না। বিশ্বনাথের যে শঙ্কা ছিল, দীননাথেরও ঠিক সেই শঙ্কা মনে জাগিতেছিল; সবই নরনাথের সাফল্যের উপর নির্ভর করিতেছে—ঘোড়দৌড়ে তিনি সাহস করিয়া যে ঘোড়ার উপর সর্ব্বস্ব বাজি রাখিয়াছেন, যদি কোন কারণে সে বাজি জিতিতে না পারে! তাহা হইলেই

ত সর্ব্বনাশ! তিনি প্রথমে মনে করিলেন, লিখিয়া দিবেন, এখন মেয়ে পাঠাইবেন না; কিন্তু গৃহিণীর পরামর্শ অন্যরূপ হইল—"যা'বার কথায় তবে মেয়ের মুখে যেন হাসি ফুটেছে। না পাঠালে কি হয়?" অগত্যা দীননাথ সম্মতি দিলেন এবং নির্দ্দিষ্ট দিনে পাল্কী-বেহারা আসিয়া শ্রীমতীকে লইয়া গেল।

শ্বশুরবাড়ীতে শ্রীমতীর আদর-যত্নের কোন ত্রুটী হইল না—সে কতকটা তাহার নিজের জন্য, কতকটা নরনাথের জন্য। সে যে সঙ্গে-সঙ্গে কত সম্পদ আনিয়াছে, তাহা মনে করিয়া ঠাকুরমা ও মা তাহাকে আদর করিতেন—আর সে আদর আরও বাড়িবার কারণ, সে নরনাথের স্ত্রী, নরনাথই সকলের আশার একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু স্বামীকে আবার কাছে পাইয়া শ্রীমতী যে আনন্দ অনুভব করিল, তাহাতে তাহার মনে হইল—আর কাহারও আদর-যত্ন না পাইলেও তাহার সুখের নদী জোয়ারে ভরা থাকিত।

সে হইতেই এবংশের মান-যশ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তবুও সে ধনীর দুহিতা, সে বিষয়ে সে বিশেষ সাবধান হইবে—সে ঠাকুরমা'র মা'র, এমন কি যা'দের হাত হইতেও ঘর-সংসারের কায আগ্রহ করিয়া লইয়া আপনি করিত, তাহাতে ঠাকুরমা ও মা তাহার অজস্র প্রশংসা করিতেন। সে প্রশংসায় নরনাথ যে বিশেষ আনন্দিত হইত, তাহা বুঝিতে পারিয়া সে আরও সাগ্রহে ও সানন্দে গৃহকর্ম্ম করিত; কারণ, নরনাথের প্রশংসা লাভের জন্য সে কি না করিতে প্রস্তুত ছিল?

কিন্তু সুখের দিন যেন দেখিতে-দেখিতে কাটিয়া যায়—নরনাথের পূজার ছুটী ফুরাইয়া আসিল। শ্রীমতী মনে করিল—এত শীঘ্র!

এই কয় দিন এত আনন্দ লাভ করিয়া নিরানন্দ গৃহে সে কেমন করিয়া থাকিবে ?

বিদায়ের সময় নরনাথ দেখিয়া গেল, শ্রীমতীর নয়ন ভরিয়া অশ্রু ঝরিতেছে !

বাতাস মেঘকে উড়াইয়া আনিতে পারে, কিন্তু বারিবর্ষণ করাইতে পারে না। তেমনই কর্ত্তব্য মানুষকে অপ্রীতি গোপন করাইতে পারে, কিন্তু হৃদয়ে প্রকৃত প্রীতি অনুভব করাইতে পারে না। সে জন্য যাহার প্রয়োজন, নরনাথের পক্ষে শ্রীমতীর ব্যবহার তাহাও আনিয়া দিয়াছিল। কাযেই নরনাথের যে ব্যবহার কর্ত্তব্যে আরব্ধ হইয়াছিল, তাহা প্রীতিতে মধুর হইয়া উঠিয়াছিল। তাই কলিকাতায় আসিয়া নরনাথ যখন প্রথম শ্রীমতীকে পত্র লিখিল, তখন তাহা নিছক কর্ত্তব্য পালনের জন্য নহে; পরন্তু তাহার মধ্যে তাহার আপনার আনন্দও ছিল। তাই পত্রখানা কেবল নীরস কুশল প্রশ্নে আরম্ভ হইয়া আপনার কুশলজ্ঞাপনে শেষ হইল না—একটু দীর্ঘও হইল, কাব্যরসে একটু কেমন সরসও হইল। কিন্তু অবিলম্বে সে পত্রের যে উত্তর সে পাইল, তাহাতে তাহার আশা মিটিল না। কারণ, উত্তরে সে যত কথার কল্পনা করিয়াছিল, তত কথা বা তাহার ও অধিক কথার পত্র পাইয়া শ্রীমতীর মনের মধ্যে আসিলেও তাহার শিক্ষা তাহাকে সে-সব কথা প্রকাশ করিবার যোগ্যতা প্রদান করে নাই।

এইবার কিন্তু নরনাথের কর্ত্তব্যজ্ঞান ও কর্ত্তব্যে অবিচলিত থাকিবার দৃঢ় সঙ্কল্প তাহাকে শ্রীমতীর প্রতি বিরক্তি হইতে রক্ষা করিল। উত্তরে সে কোনরূপ হতাশার আশ্বাস দিল না এবং নিজের মনকেও সে বুঝাইতে

চেষ্টা করিল, শ্রীমতী যদি তাহার কল্পনার মত না-ও হইয়া থাকে, তবুও স্ত্রী বলিয়া সে যেমন তাহাকে ভালবাসিবে, তেমনই শ্রীমতীর পত্রে যে ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা যদি তাহার কল্পনানুরূপ না-ও হইয়া থাকে তবুও সে তাহাতে বিরক্ত হইবে না। এইরূপে নির্দ্দিষ্ট ব্যবধানে শ্রীমতীকে পত্র লেখা যখন কর্ত্তব্যমাত্রে পর্য্যবসিত হইল, তখন পত্রের উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা বা পত্র লিখিবার জন্য কোন ভাবনা তাহাকে আর তাহার পাঠ হইতে বিচলিত করিতে পারিল না। পরীক্ষায় তাহার সাফল্য সম্ভাবনায় কোনরূপ সন্দেহের স্পর্শানুভব হইল না।

নরনাথ মনে করিল, ভালই হইল।

কিন্তু সে-ভুল ভাঙ্গিতে বিলম্ব হইল না। বড়দিনের ছুটীতে সে আবার বাড়ী গেল এবং তখন আবার শ্রীমতীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। অল্পশিক্ষিতা শ্রীমতী পত্রে ভাষায় যে ভাব ব্যক্ত করিতে পারে নাই, সাক্ষাতে তাহার মুখে-চক্ষুতে সে-ভাব এমন স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল যে, সে-বিষয়ে কোনরূপ ভুল করিবার অবকাশ আর রহিল না।

শ্রীমতীর জন্য সংসারে কত সুবিধা হইয়াছে, তাহাও নরনাথ ভাল করিয়া বুঝিল। মানুষ যদি সমুদ্রে পড়ে, তবে নিরাশাই তাহার দেহ ও মন হইতে সমস্ত শক্তি হরণ করিয়া তাহাকে মৃত্যুর মুখে অগ্রসর করিয়া দেয়—সে বাঁচিবার চেষ্টাও করিতে পারে না। কিন্তু সে যদি নিকটে কূল দেখে, তবে তাহার বাঁচিবার চেষ্টা হয়। দীননাথের কবল হইতে সম্পত্তি উদ্ধার হইলে শিবনাথ ও হরনাথও যেন পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। এত দিন তাহারা মনে করিত, তাহাদের সামর্থ্য সামান্য—সেতুবন্ধনে কাঠবিড়ালের সাহায্যে সত্যসত্যই কোন উপকার হয় না। এখন তাহারা সাহস পাইল; সঙ্গে সঙ্গে বুকে যেন বল

আসিল। সম্পত্তি পিতার নামে—দীননাথ বিনা সর্ত্তে পাওনা ছাড়িয়া দিয়াছেন; কাজেই তাহারা নরনাথের সহিত সমান অংশ পাইবে। শিবনাথ জিলার উপর এক জমীদারের কাছারীতে সদরনায়েবী চাকরী লইয়া গিয়াছিল। হরনাথ নিজ সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে পিতাকে সাহায্য করিতেছিল। সংসারের উপরে যে একটা শঙ্কার অন্ধকার ঘন হইয়া আসিতেছিল, তাহা দূর হইয়া গিয়াছে।

এ সবই শ্রীমতীর জন্য।

নরনাথের মনে হইল, সে যে সঙ্কল্প করিয়াছিল, পালিত-পরিবারের সমৃদ্ধির ভগ্নচূড়া পুনর্গঠিত করিবে, সে বিষয়ে শ্রীমতী তাহার সহায় হইয়া আসিয়াছিল—সে-ই সব উপকরণ যোগাইয়াছে। এ সাহায্য সে যাহার কাছে পাইয়াছে, তাহার উপর প্রসন্ন না হইয়া থাকা যায় না। কেবল সে নহে—সে দেখিত, শ্রীমতীর উপর বাড়ীর সকলেই প্রসন্ন। শ্রীমতী তাহার সঙ্গে যে পালিত-পরিবারের সৌভাগ্য ফিরাইয়া আনিয়াছিল, তাহার ব্যবহারে সে জন্য কোনরূপ গর্ব্বের লক্ষণ পাওয়া যাইত না; বাস্তবিক সে কখন সে কথা মনে করিত না। পরন্তু কেহ সে কথা বলিলে সে লজ্জায় একান্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িত—ছিঃ—সে ত নরনাথের মত স্বামী পাইয়া ধন্য হইয়াছে; তাহার সম্বন্ধে এ কথা কেন? এই মনোভাবই শ্বশুরবাড়ী তাহার ব্যবহারে মাধুর্য্য-সঞ্চার করিত।

বড়দিনের ছুটী অল্পদিনের। সে ছুটী শেষ করিয়া নরনাথ যখন কলিকাতায় ফিরিয়া গেল, তখন শ্রীমতীর সম্বন্ধে সে কর্ত্তব্য ছাড়া আর একটা ভাব মনে লইয়া গেল,—সে প্রসন্নতা,—ভালবাসা বলিতে হয় বল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার পূর্ব্ব সঙ্কল্প যেন প্রবল হইয়া উঠিল। শ্রীমতী যাহার সূচনা করিয়া দিয়াছে, তাহাকে তাহা সম্পূর্ণ করিতে হইবে। শ্রীমতী

ধনীর দুহিতা—সে তাহাকে প্রাচুর্য্যের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত করিবে। পিতামহীর দেহে জরার লক্ষণ দিন দিন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। এখন তিনি পূর্ব্বের মত সংসারের সব কাজ করিতে পারেন না—যে ঘড়া লইয়া তিনি পূর্ব্বে ঘাটে যাইতেন, তাহার ভার তিনি আর বহিতে পারেন না। নরনাথ কেবলই মনে করিত—আর কয়টা বৎসর! ঠাকুরমা যেন তাহাকে সংসারে প্রবেশ করিতে—অর্থার্জ্জন করিতে দেখিয়া তবে হাসিমুখে—পালিত-পরিবারের সমৃদ্ধি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া জীর্ণ দেহ রক্ষা করেন। তিনি একবার তীর্থদর্শনে যাইবার ইচ্ছা করিয়াছেন; সে যেন তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারে।

এই সব কথা মনে করিয়া সে সাগ্রহে ও সানন্দে পরিশ্রম করিতে লাগিল—উদ্দেশ্য, সে সাফল্য লাভ করিবেই।

সে যে সাফল্য লাভ করিবে, সে বিষয়ে তাহারও যেমন সন্দেহ ছিল না, আর কাহারও তেমনই ছিল না। কিন্তু সাফল্যের শেষ সোপান অতিক্রম করিয়া যাইবার জন্য তাহার ব্যাকুলতা কেহ সম্যক বুঝিতে পারিত না; যাহারা তাহা অনুমান করিত, তাহারা বিস্মিত হইত—এত তাড়াতাড়ি কেন? তাহার কোন সতীর্থ একদিন তাহাকে পরীক্ষার কালের জন্য ব্যগ্র দেখিয়া বলিয়াছিল, "আমরা রাত্রি থাকিতে শয্যাত্যাগ করিলেই কি শীঘ্র-শীঘ্র রাত্রি শেষ হইবে?" সে কথা যে নরনাথ জানিত না, এমন নহে। কিন্তু তবুও তাহার যেন বিলম্ব সহিতেছিল না।

বৎসর ঘুরিয়া গেল এবং তাহার পরীক্ষার সময়ও নিকটবর্ত্তী হইল।

তখন বিশ্বনাথ কতকটা গুছাইয়া উঠিয়াছেন—শিবনাথ ও হরনাথ

আশায় বুক বাঁধিয়া কাজ করিতেছে—পিতামহীর মুখের উপর হইতে বিষাদের গাঢ় ছায়া সরিয়া গিয়াছে—বিমাতা নরনাথের জন্য যে অলঙ্কার খুলিয়া দিয়াছিলেন, নূতন ও মূল্যবানতর অলঙ্কার তাহার পরিবর্তে তাঁহার অঙ্গে স্থান লইয়াছে—বিশ্বনাথের মুখে হাসি ফুটিয়াছে—আর শ্রীমতীর দেহে যৌবনের জোয়ার আসিয়াছে !

নরনাথ পরীক্ষা দিয়া বাড়ী আসিল।

ট্রেণের সময় যে বদল হইয়াছিল, তাহা বাড়ীর মহিলারা জানিতেন না। তাই সে যখন বাড়ীতে আসিল, এবং পিতাকে প্রণাম করিয়া বাড়ীর মধ্যে গেল, তখন ঠাকুর মা ও মা ঘাটে গিয়াছেন। তাঁহারা অনুপস্থিত দেখিয়া নরনাথ উপরে আপনার ঘরে গেল। শ্রীমতী তখন কাপড় কাচিয়া আসিয়াছে—আজ সে সকাল-সকালই কাপড় কাচিয়া আসিয়াছিল। ঘরের মেঝেয় বসিয়া সে প্রসাধন করিতেছিল। প্রিয়-সমাগমের আশায় তাহার মনের আনন্দ তাহার মুখে-চোখে ফুটিয়া উঠিতেছিল।

এমন সময় নরনাথ কক্ষে প্রবেশ করিল। পদশব্দে চাহিয়া শ্রীমতী দেখিল—নরনাথ! কিছুক্ষণ সে এমনই মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল যে, প্রসাধন ছাড়িয়া উঠিয়া অযত্ন বিন্যস্ত বস্ত্রাঞ্চল তুলিয়া, লইতেও ভুলিয়া গেল। তাহার পর সে তাড়াতাড়ি অঞ্চলটা মাথায় তুলিয়া দিয়া উঠিয়া আসিয়া নরনাথকে প্রণাম করিল।

নরনাথ বলিল, "কাপড়খানা যে আলতার রঙে রাঙা হ'য়ে উঠলো—"

বলিয়া সে পদপ্রান্তে প্রণতা পত্নীকে তুলিয়া আলিঙ্গন করিল। যেটুকু আলতার রং শ্রীমতীর অঙ্গুলীতে ছিল, তাহা তাহার জামায় লাগিয়া গেল।

দুই জনই হাসিতে লাগিল।

নরনাথ হাতে মুখে জল দিয়া জামাটা বদলাইয়া ফেলিল।

ততক্ষণে নীচে—প্রাঙ্গনে ঠাকুরমা'র কণ্ঠস্বর শুনা গেল। তিনি ছোট ঘড়াটা নামাইতে না নামাইতে নরনাথ তাঁহার কাছে উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে ও বিমাতাকে প্রণাম করিল।

প্রায় একসঙ্গেই উভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এর মধ্যে এলি যে ?"

নরনাথ উত্তর দিল, "এখন গাড়ী যে আগে আসে।"

"ও মা, তা'ত জানি নে। হাতে মুখে জল দিয়েছিস ?"

"দিয়েছি।"

"বৌমা, শীগ্গীর কাপড়খানা ছেড়ে নরুর জন্য জলখাবার গুছিয়ে নিয়ে এস।"

মা কাপড় ছাড়িয়া আসিয়াই রোয়াকের উপর একা জায়গায় আসন পাতিয়া দিয়া গেলেন। নরনাথ বসিল। তাহার পর মা একখানি রেকাবীতে জলখাবার সাজাইয়া আনিলেন এবং আসনের সম্মুখের স্থানটীতে জলহাত বুলাইয়া হাত ধুইয়া রেকাবীখানি তথায় রাখিয়া দিলেন।

ঠাকুরমা আসিয়া কাছে বসিলেন এবং বলিলেন, "একজামিনের পড়া পড়ে-পড়ে রোগা হয়ে গেছিস।"

মা বলিলেন, "তাই ত।"

এই সব স্নেহোক্তির স্বরূপ নরনাথ জানিত। সে হাসিয়া বলিল, "তোমাদের কাছে পাঁচ দিন থাক্‌লেই আবার মোটা হয়ে যা'ব।"

ঠাকুরমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছোট বৌর সঙ্গে দেখা হয়েছে ?"

নরনাথ সে কথা যেন শুনিতেই পায় নাই, এমনই ভাবে আহার করিতে লাগিল।

ঠাকুরমা উঠিয়া "আসি" বলিয়া উপরে গেলেন। তিনিই শ্রীমতীকে সকাল সকাল কাপড় কাচিয়া আসিতে বলিয়াছিলেন এবং সে আসিলে আপনি ঘাটে যাইবার পূর্ব্বে তাহাকে প্রসাধন সম্বন্ধে বিস্তৃত উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন ; মনে করিয়াছিলেন, আসিয়া তাহার চুলটা বাঁধিয়া দিবেন। তিনি মিত্রদের বাড়ীর মেয়ের পাতাকাটা চুল-বাঁধা দেখিয়া অবধি শ্রীমতীকে সেইরূপে চুল বাঁধিতে বলিতেন। শ্রীমতীর কপালখানা কিছু বড় থাকায় তাহাতে তাহাকে দেখাইতও ভাল।

ঠাকুরমা উপরের ঘরে যাইয়া দেখিলেন, শ্রীমতী আন্‌মনার মত বসিয়া আছে, তাহার এক পায় আলতা পরা শেষ হইয়াছে, আর এক পায় হয় নাই। ঠাকুরমা আসিয়া ডাকিলে সে যেন চম্‌কাইয়া উঠিল— যে লজ্জা এতক্ষণ সে অনুভব করে নাই, এখন সেই লজ্জা অনুভব করিল।

ঠাকুরমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "নরু এসেছিল ?"

শ্রীমতী লজ্জায় মুখ নত করিল।

ঠাকুরমা বলিলেন, "আমি সাত তাড়াতাড়ি গা ধুয়ে আস্‌তে বললাম ; তা কি একটু শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর পায়ে আলতা প'রে, শান্তিপুরে কাপড়খানা পর্‌তে পারনি ? কত দিন পরে, বাড়ী এল ! তোমার যদি কিছু বুদ্ধি থাকে ! শীগ্‌গীর আলতা পরা শেষ করে নাও। আমি বৌমা'কে পাঠিয়ে দিচ্ছি—চুলটা বেঁধে দেবে ।"

এই কথা বলিয়া তিনি সিন্দুকের উপর হইতে শান্তিপুরে শাড়ীখানা লইয়া মেজের উপর রাখিয়া বলিলেন, "এই কাপড়খানা পর্‌বে। বুঝলে ?"

ঠাকুরমা নামিয়া গেলেন এবং পুত্রবধূকে ডাকিয়া বলিলেন, "ছোট বৌ'র যদি কিছু বুদ্ধি আছে! তুমি উপরে যাও, তা'র চুলটা বেঁধে দাও। ...সেই তেমনি ক'রে বাঁধবে। বুঝতে পেরেছ?"

"পেরেছি"—বলিয়া মা উপরে গেলেন।

তারপর শিবনাথের স্ত্রীকে ডাকিয়া ঠাকুরমা বলিলেন, "বড় বৌ, সকাল-সকাল উনুনে আগুন দাও। নরুর ও-বেলা ভাল খাওয়া-দাওয়া হয়নি।"

পুরুষদিগের আহার শেষ হইলে ঠাকুরমা সর্ব্বাগ্রে শ্রীমতীকে ডাকিলেন, "তুমি আগে খেয়ে নাও।"

সে লজ্জায় ইতস্ততঃ করিতেছিল। মা বলিলেন, "দোষ কি, ছোট বৌমা! বস।"

অগত্যা শ্রীমতী খাইতে বসিল। কিন্তু লজ্জায় সে মুখ তুলিতে পারিল না।

তাহার আহার শেষ হইলে ঠাকুরমা তাহার হাতে পান দিয়া বলিলেন, "তুমি যাও।" কিন্তু সে যাইবার পূর্ব্বে হ্যারিকেন লণ্ঠনটি তুলিয়া ধরিয়া দেখিলেন, বৌমা তাঁহার উপদেশমত পাতা কাটিয়া—কপাল ঢাকিয়া তাহার চুল বাঁধিয়া দিয়াছেন কি-না; আর খয়েরের টিপটি মুছিয়া গিয়াছে কি-না। যখন তিনি দেখিলেন, চুল বাঁধা মনোমত হইয়াছে এবং টিপটিও মুছে নাই, তখন তিনি শ্রীমতীকে ছুটী দিলেন।

ঘরের ভিতর হইতে ইহা দেখিয়া শিবনাথের স্ত্রী ও হরনাথের স্ত্রী গা-টেপাটিপি করিয়া হাসিতেছিল।

শ্রীমতী কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিতেই নরনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "দুই পায়েই আলতা পরা হয়েছে ত? না এক পায়ে এখনো বাকি আছে?" বলিয়া সে হাসিতে লাগিল। শ্রীমতীও হাসিল।

ঠাকুরমা অনেকদিন হইতেই একবার তীর্থদর্শনে যাইবার ইচ্ছা করিতে-ছিলেন ; কিন্তু পুত্রের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া সে কথা তেমন-ভাবে প্রকাশ করেন নাই। প্রথম প্রথম তাঁহার মনে ছিল, শেষ যে কয়খানা মোহর ছিল, তাহাই ভাঙ্গাইয়া তীর্থে যাইবেন। কিন্তু নরনাথের শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্য সে কয়খানাও ভাঙ্গাইয়া ফেলিতে হইয়াছিল।

কিন্তু তাঁহার এই ইচ্ছার কথা নরনাথ জানিত। তাই সে একদিন পিতার কাছে বলিল, "ঠাকুরমা অনেক দিন থেকেই একবার তীর্থে যাবার ইচ্ছা করছেন, একবার পাঠাতে পারা যা'বে কি ?"

বিশ্বনাথ বলিলেন, "কত খরচ পড়বে ?"

নরনাথ বলিল, "হিসেব করে বলব।"

সে যখন ঠাকুরমাকে তিনি কোন্ কোন্ তীর্থস্থানে যাইবেন জিজ্ঞাসা করিল, তখন মা বলিলেন, "বাবা, আমি কিন্তু যা'ব।"

ঠাকুরমা বলিলেন, "তুমি এখন যা'বে কেন ?"

মা বলিলেন, "সে হ'বে না, মা। আমি কিছুতেই তোমার সঙ্গ ছাড়বোনা।"

নরনাথ বলিল, "আচ্ছা তুমিও যাবে। এখন জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নাও। আমারও সময় আছে হাতে।"

শেষে সে বলিল, "বৃন্দাবন, মথুরা, প্রয়াগ, কাশী সব তোমাদের দেখিয়ে আনবো চল।"

তাহার পর আপনার ঘরে যাইয়া টাইমটেবল্ দেখিয়া নরনাথ খরচ খতাইতে লাগিল। টাইমটেবল্ সে এই জন্যই সঙ্গে আনিয়াছিল।

সে হিসাব করিয়া বিশ্বনাথের কাছে গেল এবং যত টাকা লাগিবার সম্ভাবনা, তাহা জানাইয়া বলিল, "আমি বলেছি, শুধু মথুরা, বৃন্দাবন, প্রয়াগ আর কাশী দেখিয়ে আনব ; আর কোথাও যাওয়া হ'বে না।"

বিশ্বনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যা'বে ?"

"একজনকে ত সঙ্গে যেতে হ'বে।"

"তোমার মাও যাবেন ?"

"তিনি অনেক ক'রে বলছেন, না নিয়ে গেলে বড় দুঃখিত হ'বেন।"

"তা এ টাকা আমি দিতে পারব, এখন তুমি আর-সব ব্যবস্থা কর।'

যে দিন এই সব কথা হয় সেই দিন অবনীমোহন ভগিনীকে দেখিতে আসিয়াছিল। সে সব শুনিয়া গেল।

পরদিনই দীননাথের কাছ হইতে পত্র লইয়া লোক আসিল। পত্রে দীননাথ লিখিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রীও জিদ ধরিয়াছেন, তীর্থে যাইবেন ; নরনাথ যখন যাইতেছে, তখন, বোধহয় কোন অসুবিধা হইবে না।

বিশ্বনাথ মা'কে পত্রের কথা জানাইলেন। ঠাকুরমা বলিলেন, "তা' বেশ ত, লিখে দাও, মেয়েকে আমি সঙ্গে নিয়ে যা'ব।"

শ্রীমতী পিত্রালয়ে গেল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে সকলে যাত্রা করিলেন।

মথুরা হইতে বৃন্দাবন ষ্টেশনে উপস্থিত হইতেই পাণ্ডার দল ঘিরিয়া দাঁড়াইল, আর বালকেরা গান গাহিয়া ভিক্ষা চাহিতে লাগিল।

নরনাথের এক সতীর্থদের বৃন্দাবনে একটা 'কুঞ্জ' ছিল—নরনাথ সেই কুঞ্জে বাসা লইবার ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছিল। কুঞ্জের 'কামদার' ষ্টেশনেই ছিলেন। তিনি গাড়ী ভাড়া করিয়া—মাল গুছাইয়া সকলকে 'কুঞ্জে' লইয়া গেলেন। বৃন্দাবনে 'ব্রজবাসী' নামে পরিচিত বানরের আধিক্যে সকলে যেমন বিস্মিত—তেমনই বিরক্ত হইলেন।

আহারাদির পর 'দর্শনের' পালা। মদনমোহন, বঙ্কুবিহারী, গোপীনাথ দর্শন করিয়া সকলে গোবিন্দজীর মন্দিরে উপনীত হইলেন। পুরাতন ভগ্ন মন্দিরের পশ্চাতে নূতন ক্ষুদ্র গৃহে যুগলরূপ দর্শন করিয়া সকলে শেঠের মন্দিরে আসিলেন। সে মন্দিরে আর একজন বাঙ্গালী 'দর্শনে' আসিয়াছিলেন এবং সকলে তাঁহাকে বিশেষ সমাদর করিতেছিল। তখন মন্দিরের সেবাদির ভার সুদর্শন শাস্ত্রীর উপর ন্যস্ত। বাঙ্গালী ভদ্রলোকটি শাস্ত্রী মহাশয়ের কাছে বসিয়া কৃষ্ণলীলার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার আলোচনা করিতেছিলেন। নরনাথ শুনিল, তিনি মধ্যবঙ্গের একজন প্রসিদ্ধ জমীদার—কলিকাতাতেই বাস করেন। তিনি যে ভাবে শাস্ত্রী-মহাশয়ের সহিত আলোচনা করিতেছিলেন, তাহাতে বুঝা-যায়—তিনি বৈষ্ণব-সাহিত্য ও দর্শন পাঠ করিয়াছেন। নরনাথকে দেখিয়া শাস্ত্রী-মহাশয় বসিতে বলিলেন। সে বসিয়া তাঁহাদের আলো-

চনার মধ্যে দুই চারিটি কথা বলিতেই রাজা স্থরপতি বলিলেন, "আপনি দেখছি, ইংরাজী দর্শন-শাস্ত্র ভাল রকমই পড়েছেন।"

নরনাথ উত্তর করিল, "আজ্ঞে না, ভাল রকম পড়িনি—কেবল পরীক্ষার তাড়ায় যা কিছু পড়তে হয়েছে।"

রাজা স্থরপতির সহিত তাহার পরিচয়ের পর তিনি নরনাথকে তাহার বাসস্থানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি স্বয়ং 'পুলিনে' বাড়ী লইয়াছিলেন।

মহিলাদিগকে লইয়া নরনাথ কুঞ্জে ফিরিয়া গেল। তখনও সূর্য্যাস্ত হয় নাই। তাই সে আবার একা বাহির হইয়া পড়িল। ঘুরিতে ঘুরিতে সে পুলিনে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং জিজ্ঞাসা করিয়া স্থরপতি যে বাড়ীর কথা বলিয়াছিলেন, সেই বাড়ীতে উপস্থিত হইল। বাড়ীখানি এককালে যমুনার উপরেই ছিল। এখন যমুনা বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে—রক্তপ্রস্তরে রচিত ঘাটের সোপানগুলি শুষ্কভূমির উপর নামিয়া গিয়াছে। বাড়ীখানি বড়।

নরনাথ যমুনার দিক হইতে আসিয়াছিল। সে যখন তথায় উপস্থিত হইল, তখন ঘাটের চাতালের উপর সতরঞ্চি পাতিয়া তাহার উপর ধব্‌ধবে সাদা জাজিম পাতা হইয়াছে। তাহার উপর বেশ মজলিস্ জমিয়াছে। গান-বাজনা হইতেছে। এক্ যুবতী স্থমধুর কণ্ঠে গাহিতেছিল :—

"উচল বলিয়া অচলে উঠিনু,
পড়িনু অগাধ জলে ;
লছমী চাহিতে দারিদ্র্য বেড়ল,
মাণিক হারানু ছলে।"

তাহাদিগকে দেখিয়া নরনাথ সরিয়া যাইতেছিল। কিন্তু সুরপতি তাহাকে দেখিতে পাইয়াই উঠিয়া আসিলেন এবং সোপান-শ্রেণীতে নামিয়া আহ্বান করিলেন, "আসুন, আসুন!"

তাঁহার ইঙ্গিতে গায়িকা ও তাহার সঙ্গিনী উঠিয়া গেল।

নরনাথ আসিয়া বসিলে সুরপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি বোধ হয় গাইতে জানেন?"

নরনাথ অস্বীকার করিতে পারিল না।

তাহার পর সুরপতির অনুরোধে সে গান গাহিল। গাহিবার পূর্ব্বে সে বলিল, "স্থান যখন বৃন্দাবন—যমুনা-পুলিন, সময় সন্ধ্যা, তখন বৃন্দাবন-গাথাই গাই।" সে দূতীর সেই আহ্বান গান গাহিল—

"ব্রজের শ্যাম ব্রজে চল"—

তখন আকাশে তারকার দীপ জ্বলিতে আরম্ভ হইয়াছে, শীর্ণকায়া যমুনার পরপারে ঘনশ্যাম 'বন-তরুর' মাথার উপর আকাশে দিনের আদরের চিহ্ন—একটু কনককিরণ নিভিতে নিভিতেও মেঘের উপর সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতেছে; ঝাঁকে ঝাঁকে টীয়া পাখী গাছের সবুজ পাতার মধ্যে সবুজ দেহ মিশাইয়া রাত্রির মত আশ্রয় লইয়াছে; দূরে ও অদূরে বহু মন্দিরে আরতির বাজনা শুনা যাইতেছে। সমস্ত প্রকৃতি কোমল ভাবে পরিপূর্ণ; আর মন বৃন্দাবন-লীলা-মাধুরীর স্মৃতিতে পরিপূর্ণ! ভাবে মুগ্ধ হইয়া নরনাথ শ্যামবিরহিণী বৃন্দাবনগোপী-দিগের বেদনাব্যঞ্জক সেই গানটি গাহিল। যে শুনিল, তাহারই মনে হইল—বুঝি এমন গান সে আর কখন শুনে নাই! যে গায়িকা উঠিয়া গিয়াছিল, সে-ও মুগ্ধ হইয়া গান শুনিতেছিল। গান শেষ হইলে সে

সঙ্গিনীকে বলিল, "যেমন গৌরাঙ্গের মত রূপ, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর মত গলার স্বর!"

সুরপতি বলিলেন, "কি চমৎকার গলা আপনার! মনে হচ্ছে যেন এই বৃন্দাবনের বুকের মধ্যে থেকে, সত্য সত্যই ব্যাকুল বাসনা আপনাকে প্রকাশ করছে, সে সর্ব্বত্যাগী হয়ে প্রেম-যমুনার বারি পান ক'রে কৃতার্থ হয়ে যাবে।"

নরনাথ তখন বিদায় লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কে সেই দুইজন রমণী যাহারা তাহার পূর্ব্বে এই চাতালে বসিয়া গান গাহিতেছিল? তাহাদের ভাব দেখিয়া নরনাথ ভাল বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু সুরপতি যখন হিন্দু, তখন সেই অপরিচিতাদ্বয়ের সম্বন্ধে নরনাথ তাহার-মনের সন্দেহ কিছুতেই দূর করিতে পারিতেছিল না। তাই সে চলিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল।

সুরপতি তাহাকে আর একটু থাকিবার জন্য—অন্ততঃ একটু 'মিষ্টমুখ' করিয়া যাইবার জন্য জিদ করিলেও সে আর অপেক্ষা করিল না—উঠিয়া পড়িল।

সুরপতি এক ভৃত্যকে লণ্ঠন লইয়া তাহার সঙ্গে যাইতে আদেশ করিলেন। ভৃত্য লণ্ঠন আনিতে গল। সেই সময় গৃহের দ্বিতলে, বাতায়নে আলো জ্বলিয়া উঠিল এবং সেই দিকে চাহিয়া নরনাথ দেখিল, সেই তরুণী গায়িকার চক্ষু তাহারই দিকে নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে! দেখিয়াই নরনাথ দৃষ্টি নত করিয়া লইল।

ফিরিবার পথে সে কেবল ভাবিতে লাগিল, সে কি যাইয়া ভাল করিয়াছিল?

নরনাথ চলিয়া গেলে সুরপতি উপরে গেলেন।

গায়িকা তরঙ্গিণী বলিল, "গলা বটে !"

সুরপতি হাসিয়া বলিলেন, "তোমার যেমন ভাল লেগেছে, তা'তে দেখছি ছেলেটিকে ডেকে এনে সেই গানটা শেখাতে হবে—'তরঙ্গিণী, তরঙ্গে তোর নূতন তরণী !' কি বল ?"

তরঙ্গিণী বিলোল কটাক্ষপাত করিয়া বলিল, "নতুনে আর কাজ নেই, পুরাণ দড়া না ছিঁড়লেই বাঁচি।"

পরদিন মহিলাদিগকে মন্দিরে মন্দিরে 'দর্শন' করাইয়া আসিয়া নরনাথ দেখিল, বড় বড় রূপার থালায় নানারূপ প্রসাদ লইয়া চারি জন ব্রাহ্মণ তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে—তাহারা সুরপতির কাছ হইতে আসিয়াছে।

দেখিয়া ঠাকুরমা ও মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কোত্থেকে এল, নরু ?"

বাহকদিগকে পাত্র ও "বিদায়" দিয়া নরনাথ বলিল, "রাজা সুরপতি পাঠিয়েছেন।"

"রাজা !"

"হ্যাঁ। কাল শেঠের মন্দিরে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। দেখ দেখি বিপদ্ ! তিনি রাজা, তিনি থালা-থালা খাবার পাঠাতে পারেন। কিন্তু আমরা কি করব ?"

"রাজা কি বামুন ?"

"হ্যাঁ।"

"তবে দোষ নেই, নরু।"

"না থাকলেই মঙ্গল।"

রাজার সঙ্গে জামাইয়ের এত আলাপ, ভাবিয়া শ্রীমতীর মাতার

বুকটা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল! তাহার পর বৈকালে নরনাথ বাহির হইবার পূর্ব্বেই স্বয়ং রাজা সুরপতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ঠাকুরমা প্রভৃতি নরনাথের অপেক্ষাও অধিক ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন—রাজা—কোথায় বসিবেন!

সুরপতির ব্যবহারে কিন্তু নরনাথের ব্যস্তভাব দূর হইয়া গেল। আসন আনিবার পূর্ব্বেই তিনি রোয়াকের উপর বসিয়া পড়িলেন। নরনাথ "করেন কি?"—বলিলে তিনি উত্তর দিলেন, "আপনি হাল-আমলের কলেজের ছেলে, তাই এ-কথা বল্‌লেন। বৃন্দাবনে লোক আসে রজ পাবার আশায়। ব্রজের রজই যে ভক্তের আকাঙ্ক্ষিত! বাঙ্গালা দেশেরই ত রাজা 'লালাবাবু' থেকে দীন-দুঃখী-দরিদ্র পর্য্যন্ত,—রাজার রাজা—ভক্তের ভগবান—রাধারমণের স্পর্শ-পূত এই রজে দেহরক্ষা করতে এসেছেন।"

তিনি নরনাথকে বলিয়া গেলেন, ফিরিবার পথে সে যেন একবার তাঁহার বাড়ী হইয়া আইসে।

রাজা চলিয়া গেলে মহিলারা একবাক্যে বলিলেন, "কি মিষ্টভাষী! কি বিনয়ী!"

দর্শনের পর ফিরিবার পথে সে দিনও নরনাথ সুরপতির গৃহে গেল। সে দিনও তাহাকে তাঁহার অনুরোধে কয়টি গান গাহিতে হইল। আসিবার সময় সে বলিয়া আসিল, পরদিন তাহারা গোবর্দ্ধন দেখিতে যাইবে এবং তাহার পরই বৃন্দাবন হইতে যাত্রা করিবে। শুনিয়া সুরপতি বলিলেন, "আমিও দু'তিন দিনের মধ্যে যা'ব। আশা করি, কল্‌কাতায় গিয়ে দেখা হ'বে।" তিনি নরনাথের কলিকাতার ঠিকানা লিখিয়া লইলেন।

গোবৰ্দ্ধন দেখিয়া আসিয়া নরনাথ যেদিন সকলকে লইয়া বৃন্দাবন ত্যাগ করিল, সেদিন সে ষ্টেশনে আসিয়া দেখিল—সুরপতি তথায় উপস্থিত। তাঁহার লোকজন, পাণ্ডা প্রভৃতি নরনাথের জিনিষপত্র গাড়ীতে তুলিয়া দিল এবং গাড়ী ছাড়িবার সময় সুরপতি বলিলেন, "দেশ থেকে কল্‌কাতায় ফিরে আমাকে খবর দেবেন।"

ঠাকুরমা বলিলেন, "নরুকে আমার যে দেখবে, সে-ই ভাল না বেসে থাক্‌তে পারবে না।"

শ্রীমতীর মাতা বলিলেন, "সে আর বলতে! বেঁচে থাক্ বাছা।"

সকলকে লইয়া নরনাথ যখন তীর্থদর্শনান্তে গৃহে ফিরিল, তখন তাহার সাফল্যে গ্রামে যেন একটা অসাধারণ চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইয়াছে। সে পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। সকলেই একবাক্যে বলিল, "ও সবই দীনু ঘোষের মেয়ের পয়! হ'ক না রংটা ময়লা—নাই বা থাক্‌ল রূপ; বাড়ীতে পা দেওয়া অবধি ঐশ্বর্য্য যেন উথ্‌লে উঠছে। যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-ঠাকরুণ ঘরে এসেছেন।"

যাহার এই প্রশংসা, সে কিন্তু এইসব কথা শুনিয়া লজ্জায় যেন মাটীর সঙ্গে মিশাইয়া যাইতেছিল। সে যে সর্ব্ববিষয়ে নরনাথের অযোগ্য—আর তবুও নরনাথ তাহাকে ভালবাসে, তাহাই মনে করিয়া শ্রীমতীর হৃদয়ে নরনাথের প্রতি ভালবাসা যেন ভক্তিতে রূপান্তরিত হইতেছিল। স্বামীকে সে কেবল বাঞ্ছিত—দয়িত মনে না করিয়া দেবতার মত মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

নরনাথ পিতার ইচ্ছায় আইন ও নিজের ইচ্ছায় এম, এ, পড়িতে কলিকাতায় গেল। কিন্তু ওকালতী অপেক্ষা তাহার দৃষ্টি রহিল আর একটা পরীক্ষার উপর—সে রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ বৃত্তি পরীক্ষা।

বৃন্দাবনে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুসারে কলিকাতায় আসিয়া নরনাথ রাজা সুরপতিকে তাহার আগমনবার্ত্তা জানাইল। তাহার পরদিনই রাজার গাড়ী তাহাদের মেসের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। নরনাথ তখন

কেবল কলেজ হইতে ফিরিয়াছে। "কৈ, নরনাথ বাবু!"—বলিয়া সুরপতি একেবারে দ্বিতলে উপস্থিত হইলেন। এক জন ছাত্র তাঁহাকে নরনাথের ঘর দেখাইয়া দিল। তিনি ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, নরনাথ ষ্টোভটি জ্বালাইয়া চা প্রস্তুত করিবার আয়োজনে ব্যস্ত। সহসা সুরপতিকে উপস্থিত দেখিয়া সে কিছু বিব্রত হইয়া পড়িল। তাহার ঘরখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল—টেবল, চেয়ার সে কক্ষে সব সুসজ্জিত—শয্যাও পরিষ্কার; কিন্তু মেসের ছেলে সে, কোন্ পাত্রে রাজাকে চা পান করিতে দিবে? সে সুরপতিকে বসাইয়া আর একটা পেয়ালার সন্ধানে পাশের ঘরে গেল এবং আর একটা পেয়ালা লইয়া ফিরিলে সুরপতি হাসিয়া বলিলেন, "আমার জন্য আন্‌লেন? বৃথা কষ্ট! আমি চা খাই—সকালে একবার। বিকেলে খেলে আমার অম্ল হয়।" তাহার পর তিনি বলিলেন, "নিন, আপনি চা খেয়ে নিন্—চলুন একটু বেড়িয়ে আস্‌বেন।"

নরনাথের চা-পান শেষ হইলে সুরপতি তাহাকে সঙ্গে লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন। যাইবার সময় মেসের আর সব ছেলেকে তিনি বলিলেন, "আপনাদের বন্ধুটিকে একটু আকাশ-বাতাস দেখাতে ধরে নিয়ে যাচ্ছি; উনি একেবারে কেতাবের পোকা হয়ে যাচ্ছেন।"

সুরপতি যে-বাড়ীতে নরনাথকে লইয়া গেলেন, সেটা তাঁহার বাসাবাড়ী নহে—বাগান-বাড়ী। বাগান ও বাড়ী উভয়ই সমান সজ্জিত। সুরপতি যখন নরনাথকে লইয়া গৃহের দ্বিতলে উঠিতেছিলেন, তখন উপর হইতে নারীকণ্ঠে গীত শ্রুত হইতেছিল :—

"আজ কেন বঁধু, অধর-কোণেতে
শুকাল হাসির রেখা?"

এ কণ্ঠ পরিচিত। বৃন্দাবনে সুরপতির গৃহে সে এই কণ্ঠে গীত শুনিয়াছিল—এই কণ্ঠের অধিকারিণীকে দেখিয়াছিল। নরনাথের মনটা দমিয়া গেল। তবে তাহার সন্দেহই সত্য। সেই নারী সুরপতির বাসভবনে বাস করে না—বাস করে তাঁহার বিলাসকুঞ্জে! তাহার ইচ্ছা হইল, সে বলে—সে আর সে গৃহে থাকিবে না—চলিয়া যাইবে। কিন্তু শিষ্টাচারের আদর্শ তাহাকে সে-কায করিতে দিল না। সে সুরপতির অনুসরণ করিয়া দ্বিতলে একটি সুসজ্জিত কক্ষে আসন গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। উভয়ে উপবিষ্ট হইলে সুরপতি কাব্যালোচনা আরম্ভ করিলেন। সুরপতি বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ইংরাজী কাব্যের সঙ্গে যে এত অধিক সুপরিচিত, তাহা নরনাথ জানিত না। বিলাসী ধনীতে এরূপ কাব্যরস দুর্ল্লভ বলিয়াই সে মনে করিত।

সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় সুরপতি বলিলেন, "নরনাথ বাবু, আপনার সঙ্গে কাব্যালোচনা ক'রে পরম প্রীতিলাভ করলাম। এবার কাব্যালোচনার যেটায় পরিসমাপ্তি, সেইটে শুনিয়ে দিন—গোটা দুই গান শুনান। বিধাতা আপনাকে যে সুকণ্ঠ দিয়েছেন, সে লোককে গান শুনাবার জন্যই। ঐ যে বাগানের সব ফুল, ওদের তিনি যে গন্ধ দিয়েছেন, তা' ওরা উপভোগ করে কি না জানিনে—কিন্তু আমাদের খুবই উপভোগ করায়।"

ভৃত্য একটা হারমোনিয়ম দিয়া গেল।

সুরপতির অনুরোধে নরনাথকে গান গাহিতে হইল। প্রথমেই সে গাহিল :—

"মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখী, সখী জাগো,—"

গানটি শেষ হইলে সুরপতির অনুরোধে আরও কয়টি গান গাহিয়া তবে সে ছুটী পাইল।

কিন্তু সে-দিন সে চলিয়া গেলেও, এক জনের কানে কেবল সেই সুরই বাজিতে লাগিল, "মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখী।" গানের সময় তরঙ্গিণী পার্শ্বের ঘরে পর্দ্দার আড়ালেই ছিল—পশ্চাতে বসিয়া সে যখন পর্দ্দা একটু সরাইয়া দেখিতেছিল, নরনাথ তখনও তাহাকে লক্ষ্য করিতে পারে নাই—কিন্তু নরনাথের সম্মুখে বসিয়া সুরপতি তরঙ্গিণীকে দেখিতে পাইয়া যে হাসি হাসিতেছিলেন, নরনাথ তাহারও অর্থ বুঝিতে পারে নাই। কারণ, এরূপ ব্যবহার তাহার কাছে নূতন এবং সুরপতি যে সত্য সত্যই আত্মীয়া ব্যতীত আর কাহাকেও বৃন্দাবনে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন বা গৃহে রাখিয়াছিলেন, তাহা সে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারে নাই। সে তখনও আপনার আদর্শ ব্যতীত অপর কোনো আদর্শে অপরকে দেখিতে শিখে নাই।

বিশেষ সে সুরপতির সহিত যতই পরিচিত হইতেছিল, ততই সুরপতির প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল। সুরপতির বিদ্যানুরাগ, কাব্যপ্রিয়তা, স্বাভাবিক শিষ্টাচার, অমায়িকতা প্রভৃতি যুবক নরনাথকে আকৃষ্ট করিত।

কিন্তু সে আকর্ষণ, বোধ হয় উভয়তঃই অনুভূত হইতেছিল। নহিলে সুরপতির গাড়ী ঘন ঘন নরনাথের মেসের দ্বারে উপস্থিত হইবে কেন? গাড়ী প্রায়ই নরনাথকে লইয়া যাইতে আসিত। কিন্তু কি জানি, যদি নরনাথ কখনও ক্ষুণ্ণ হয়, সে আশঙ্কাও সুরপতির ছিল। তাই এক এক দিন তিনিই আসিতেন এবং মেসে নরনাথের ঘরে দুই তিন ঘণ্টাকাল কাব্য বা দর্শন আলোচনা করিয়া কাটাইয়া যাইতেন। সেই সূত্রে মেসের অন্যান্য ছাত্রদিগের সঙ্গেও তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল এবং তিনি

ব্যবহারগুণে তাহাদিগকেও যেন খুব "আপনার" করিয়া লইয়াছিলেন।

---

[৯]

ছয় মাস ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের পর নরনাথ এক দিন সুরপতিকে জিজ্ঞাসা করিল, "রাজন্, একটা কথা অনেক দিন থেকে আপনাকে জিজ্ঞাসা করব মনে করি, কিন্তু সাহসে কুলোয় না। যদি অভয় দেন, তবে আজ জিজ্ঞাসা ক'রে ফেলি।"

সুরপতি বোধ হয় প্রশ্নটা অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন। তাই একটু বিচলিতভাবে উত্তর দিলেন, "তোমার আবার ভয়!"

"ভয়—যদি আপনি ধৃষ্টতা ব'লে মনে না করেন, তবে জিজ্ঞাসা করি, বৃন্দাবনে আপনার বাড়ী যাঁর গান শুনতে পেয়েছিলাম, তিনি—"

সে প্রশ্নটা শেষ করিবার পূর্ব্বেই সুরপতি বলিলেন, "সে কে?"

"হাঁ..."

"সে—তরঙ্গিণী।"

উত্তরটায় অবশ্যই প্রশ্নের সব কথা জানা গেল না। তাই নরনাথ জিজ্ঞাসুভাবে সুরপতির দিকে চাহিল।

সুরপতি বলিলেন, "আমিও অনেক দিন মনে করেছি, এ প্রশ্নটা বোধ হয় তোমার মনে উঠেছে। কিন্তু উত্তর শুনে পাছে তুমি ভয় পাও, তাই ভেবে গায় প'ড়ে বলিনি। আজ তুমি জিজ্ঞাসা করেছ—বলতেই হবে। তরঙ্গিণী রাণী নয়—ইংরাজীতে যা'কে 'Sweet heart' বলে, তাই।"

সে এইরূপ নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে মেসে আসিয়া সেদিন গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত জর্জ্জ ইলিয়টের জীবন-কথা পাঠ করিল।

কিন্তু তাহাতে যেন নরনাথের মনের সন্দেহ দূর হইল না। এই যে সম্বন্ধ, ইহা যেমনই কেন হউক না, তাহার পক্ষে ইহা জানিবার পর আর সুরপতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রাখা, বিশেষ বাগান-বাড়ীতে যাতায়াত করা সঙ্গত কি না, সে বিষয়ে তাহার বিশেষ সন্দেহ হইল।

কিন্তু পরদিন যখন সুরপতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সে তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ না করিয়া থাকিতে পারিল না। তিনি বলিলেন, "কাল তোমাকে যে কথা বলেছি, তারই সম্বন্ধে একটু আলোচনা করব বলে আজ তোমার কাছে এলাম। বোধ হয়, এখানে সুবিধা হ'বে না। চল, আমরা একটু বেড়াতে যাই—গড়ের মাঠে ব'সে আলোচনা করব।"

নরনাথ "না" বলিতে পারিল না; সে দৃঢ়তা তাহার হৃদয়ে ছিল না। তাহার সঙ্গে সুরপতির ঘনিষ্ঠতা যে অনেকের হৃদয়ে বিস্ময়ের সঞ্চার করিত, তাহা সে জানিত এবং জানিত বলিয়াই তাহা পরিহার করিতে তাহাঁর আগ্রহ ছিল না।

গড়ের মাঠে যাইয়া উভয়ে একখানা বেঞ্চে বসিলেন। সুরপতি বলিলেন, "আমি মনে করলাম, তোমাকে মিথ্যা কথা বলব না। বল্লে তুমি যেমন সরল, তা'তে তা-ই বিশ্বাস করতে। আমার এই যে সম্বন্ধ, এটা যে তোমার কাছে খুবই কেমন-কেমন বোধ হ'বে, তা-ও আমি জানতাম; কেন না, সংসার সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতা খুবই কম এবং তুমি তা'র অন্ধকার দিকটা দেখতে পাওনি। কিন্তু এ-সম্বন্ধে তোমাকে বেশী বলা আমার পক্ষেও সোজা ধৃষ্টতা

নয়। কারণ বিদ্যা-বুদ্ধিতে তুমি আমার চেয়ে অনেক উঁচুতে। চল, তোমাকে বাড়ী গিয়ে খানকতক বই দেব; সে-গুলো পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবে, এ ব্যাপারে চিন্তা ও আলোচনা করবার কত দিক্ আছে।"

দুই দিন ধরিয়া নরনাথ রাজা সুরপতি প্রদত্ত পুস্তকগুলি পাঠ করিল—সব বিষয়টা যেন আর একভাবে দেখা যাইতে লাগিল।

চতুর্থ দিন সুরপতি আসিয়া হাজির হইলেন; বলিলেন, "বই-গুলো পড়লে, নরনাথ?"

"হাঁ।"

"এখনও কি আমাকে খুব বড় অপরাধী বলে মনে হয়?"

"আপনাকে খুব বড় অপরাধী ব'লে আমি কোন দিনই মনে করি নি। কিন্তু কেন যে আপনি সমাজের নিয়ম অবজ্ঞা করেছেন, সেই-টাই বুঝতে পারিনি। এই বইগুলো প'ড়ে বুঝলাম, মানুষের কাম নিয়ন্ত্রিত করা কোন নীতির সূত্রে হয় না—তা'র আরও কারণ থাকতে পারে—থাকেও বটে।"

"তা' হ'লে বোধ হয় এ আশা করতে পারি যে, তুমি আমাকে ঘৃণা করবে না এবং আমার সঙ্গ বিষবৎ মনে ক'রে তা' বর্জ্জন করবার জন্য ব্যস্ত হ'বে না?"

নরনাথ মাথা হেঁট করিয়া লজ্জিতের ন্যায় বলিল, "না।"

"সেইটুকু জানবার জন্যই আমি এসেছি।"

সুরপতি বিদায় লইবার সময় নরনাথ বলিল, "বই ক'খানা আমার কাছে থাক, আর একবার দেখ্‌ব।"

"বেশ ত" বলিয়া সুরপতি বিদায় লইলেন।

সেই দিন সে শ্রীমতীর পত্র পাইয়াছিল। সে কিছুদিন বাড়ী যায় নাই—শ্রীমতী জিজ্ঞাসা করিয়াছে সে কবে যাইবে? তাহার প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য শ্রীমতীর যে ব্যাকুলতা, তাহার কারণ কি? ভালবাসা?—ইংরাজী পুস্তক পাঠে নবলব্ধ মতের ছুরিকা দিয়া ভালবাসা বিশ্লেষণ করিলে তাহার কি থাকে? সে শ্রীমতীকে বিবাহ করিয়াছে, পরিবারের প্রতি, পিতার প্রতি, পিতামহীর প্রতি কর্ত্তব্যপালনের জন্য। সে বিবাহের সঙ্গে ভালবাসার কোন সম্বন্ধ ছিল না; সম্বন্ধ ছিল কেবল—টাকার। কিন্তু বিবাহের পর সে পত্নী বলিয়া শ্রীমতীকে মনে করিয়াছে—আমাদের দেশে, পত্নীর পুরাতন ও পরিচিত আদর্শ লইয়াছে। সেই কি তবে ভালবাসা?

ভাবিতে ভাবিতে নরনাথ ঘুমাইয়া পড়িল এবং তদবধি সে যেন আরও ঘন ঘন শ্রীমতীকে পত্র লিখিতে লাগিল।

এই সময় তাহার একবার বাড়ী যাইবারও প্রয়োজন হইয়াছিল। ইদানীং ঠাকুরমা'র শরীর আর ভাল যাইতেছিল না। একবার জ্বরের সঙ্গে তাঁহার বুকে সর্দ্দি বসিল এবং নিউমোনিয়ার সূচনা হইল। ঠাকুরমা কিছুতেই ডাক্তারের ঔষধ ব্যবহার করিতে সম্মত হইলেন না। সেই সংবাদ পাইয়া নরনাথ বাড়ী গেল এবং জিদ করিয়া পিতামহীকে ডাক্তারী চিকিৎসা করাইতে লাগিল। সেই সময় শ্রীমতী যেরূপ সযত্নে ঠাকুরমা'র সেবা করিতেছিল, তাহা দেখিয়া নরনাথ তাহার প্রতি আরও প্রসন্ন হইয়া উঠিল।

প্রায় দুই মাস নরনাথ প্রায় প্রতি সপ্তাহেই একবার করিয়া বাড়ী যাইতে লাগিল।

দুই মাস পরে ডাক্তার বলিলেন, "এ যাত্রায় রক্ষা পেলেন বটে, কিন্তু বয়স যা' হয়েছে আর ফুস্‌ফুসের যে অবস্থা হয়ে রইল, তা'তে আর বড় বেশী দিন বাঁচবেন ব'লে মনে হয় না। এখন যতদিন থাকেন।"

শুনিয়া নরনাথের চক্ষুতে জল আসিল—এখনও যে সে বিদ্যালয় ছাড়িয়া উপার্জ্জনের পথে যাইতে পারে নাই! বেশী দিন নহে—আর দুইটা বৎসরও কি ঠাকুরমাকে বাঁচাইয়া রাখা যাইবে না?

সেবার ফিরিয়া যাইয়া সে দ্বিগুণ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতে লাগিল। সুরপতির কাছে তাহার যাতায়াতও কমিয়া গেল।

এম, এ, পরীক্ষা দিয়া নরনাথ যখন বাড়ীতে গেল, ঠাকুরমা তখন শয্যা লইয়াছেন। শ্রীমতী সযত্নে তাঁহার সেবা করিতেছিল। তাহার নিকট ও চিকিৎসকের নিকট নরনাথ যাহা শুনিল, তাহাতে সে বুঝিল, এবার মৃত্যু শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে যেন বড় আশায় হতাশ হইল। আর একটা বৎসর যদি তিনি বাঁচিতেন! একদিন কথায় কথায় সে ঠাকুরমাকে বলিয়া ফেলিল, "আমার ওকালতী একজামিনের আর একটা বৎসর আছে। সে এক বৎসর, ঠাকুরমা, তোমাকে বাঁচতেই হবে।" ঠাকুরমা বলিলেন, "না, দাদা, আর এক বৎসর এ শরীর বইবে না। কিন্তু তা'তে আর দুঃখ কি? আমি ত দেখেই গেলাম, আমার শ্বশুরের ভিটেয় আবার তাঁ'র মত লোকের আবির্ভাব হয়েছে। আমি দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি, পালিত-পরিবারের সব সমৃদ্ধি আবার ফিরে এসেছে। আমার একটা কথা কেবল মনে রাখিস, যে ছোটবৌ হ'তে এ সব হয়েছে, কোন দিন যেন তা'র মনে কেউ কষ্ট না দেয়।" তাহার পর তিনি বলিলেন, "আরও একটা কথা, ক'টা মন্দির নদীর জলে গেছে; যদি পারিস, তবে সেবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে আবার সেই ক'টা মন্দির প্রতিষ্ঠা করিস্।"

ডাক্তারের ও পিতার সহিত পরামর্শ করিয়া নরনাথ পিতামহীকে কলিকাতায় লইয়া গেল। তথায় চিকিৎসার কোন ত্রুটি হইল না।

কিন্তু চিকিৎসায় যদি রোগ সারিত, তবে অনেক লোক কখন মরিত না। পিতামহী গঙ্গাতীরে দেহরক্ষা করিলেন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে জানিয়া গেলেন, নরনাথ এম, এ, পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে।

পিতামহীর শব দাহ করিয়া শোকাকুল চিত্তে নরনাথ গ্রামে ফিরিল। এ শোক তাহার যত লাগিল, বুঝি আর কাহারও তত লাগিল না।

পিতামহীর সমারোহ শ্রাদ্ধের পর নরনাথ যখন কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল, তখন একটু চেষ্টা করিলেই সে একটা অধ্যাপকের চাকরী পাইতে পারিত। কোন কোন কলেজ হইতে তাহার কাছে সেরূপ প্রস্তাবও আসিতে লাগিল। কিন্তু সে তাহাতে সম্মতি দিল না এমন কি পিতা যখন বলিলেন, না হয় সে একটা চাকরী লউক—বাসা করিয়া থাকুক, তখনও সে বলিল,"না।" শ্বশুরও সেইরূপ বলিলে সে উত্তর দিল, সে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ ও ওকালতী পরীক্ষা দিবে—ইহার মধ্যে আবার অধ্যাপকের কায করিলে পড়ায় অমনোযোগ হইবার সম্ভাবনা।

তাহার পর সে পাঠে মন দিল।

তখন হইতে সুরপতির সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠতা যেন আরও বাড়িতে লাগিল। সুরপতি ঘন ঘন তাহার কাছে আসিতে লাগিলেন—সেও ঘন ঘন সুরপতির কাছে যাইতে লাগিল। উভয়ের একসঙ্গে সাহিত্যালোচানা হইত, সঙ্গীতের আলোচনাও হইত।

এতটা ঘনিষ্ঠতার সময় তরঙ্গিণীকে একেবারে তফাতে রাখা সম্ভব

হইল না। সময় সময় সে সম্মুখে পড়িতে লাগিল—চা'র সঙ্গে তাহার যত্ন আত্ম-প্রকাশ করিতে লাগিল—ইত্যাদি। তাহার পর দুই-একদিন সুরপতি স্পষ্ট অনুরোধ করিলেন, "নরনাথ, সেই গানটা গাও ত দাদা,—'মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখী,' তরঙ্গিণী সেইটে শুনতে চাচ্ছে।" নরনাথ যখন গান গাহিত, তখন সময় সময় পার্শ্বের ঘরের দ্বারের পর্দ্দাটা হয়ত একটু সরিয়া যাইত, পর্দ্দার গাঢ় সবুজ কাপড়ের উপর চম্পক-অঙ্গুলি দেখা যাইত—পর্দ্দার ফাঁক হইতে দীপ্ত চক্ষুর প্রশংসমান দৃষ্টি নরনাথের দৃষ্টিপথে পতিত হইত। ক্রমে এমনও হইত যে, নরনাথ শুনিতে পাইত, পর্দ্দার আড়ালে থাকিয়া তরঙ্গিণী তাহার গানের অনুসরণ করিয়া অনুকরণ করিতেছে—গুন্ গুন্ আওয়াজ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিত। কোন দিন বা এমন হইত, সুরপতি বলিতেন, "নরনাথ, তুমি ত মাষ্টারী করলে না, কিন্তু যা'র ভাগ্যে মাষ্টারী করা আছে, সে কেমন ক'রে তা খণ্ডাবে? তরঙ্গিণী তোমার গান শুনে গান শিখছে। সে গাইবে, তুমি শুন—কোথাও ভুল হচ্চে কিনা।" তরঙ্গিণী গান গাহিত, কোথাও ভুল হইলে নরনাথ তাহা সুন্দররূপে সংশোধন করিয়া দিত।

এইরূপে যত দিন যাইতে লাগিল, তত সঙ্কোচটাও কমিয়া আসিতে লাগিল।

প্রথম প্রথম তরঙ্গিণী তেমন স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষভাবে নরনাথের সঙ্গে কথা কহিত না—মধ্যে সুরপতিকে রাখিত। কিন্তু এমন করিয়া অনেক দিন চাল না। তাই ক্রমে কথাবার্ত্তা প্রত্যক্ষভাবেই চলিতে লাগিল। তবে তরঙ্গিণীর ব্যবহারে কখনও সে গাম্ভীর্য্যের ও সংযমের অভাব অনুভব করিতে পারিত না।

তরঙ্গিণীর রূপ অসামান্য না হইলেও সে রূপসী বটে। কিন্তু তাহার

রূপ যত থাকুক আর না-ই থাকুক, তাহার দৃষ্টিই সকলকে আকৃষ্ট করিত। এক এক জনের চক্ষুতে প্রতিভার দীপ্তি থাকে—এক এক জনের চক্ষুতে ভাবের গভীরতা থাকে,—এক এক জনের চক্ষুতে হৃদয়ের আবেগ যেন প্রতিবিম্বিত দেখা যায়। তরঙ্গিণীর চক্ষু দেখিলে মনে হইত, যেন গভীর হ্রদের জলে সূর্য্যালোকপাত হইয়াছে; দেখিলে মনে হয়, হ্রদের মধ্যে না জানি কি রহস্য লুকায়িত আছে! সে রহস্য কে ভেদ করিতে পারে?

তাহার পর তরঙ্গিণী সাহিত্যের আস্বাদ পাইয়াছিল।

নরনাথ যেন দোটানায় পড়িয়া গেল! সে কতকগুলা ইংরাজী ও ফরাসী পুস্তক ও মত আত্মসাৎ করিয়া স্থির করিয়াছিল বা মনকে বুঝাইয়াছিল, তরঙ্গিণীর সঙ্গে সুরপতির যে সম্বন্ধ, তাহা আমাদের সংস্কারের বিরোধী হইলেও অন্যায় নহে। কিন্তু সে সমাজের ও সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে পারে নাই; তাহাতে লোকনিন্দা অনিবার্য্য বুঝিয়া তাহার প্রতি আন্তরিক না হইলেও মৌখিক শ্রদ্ধা দেখাইতে ত্রুটি করিত না। ফলে হইল, তরঙ্গিণীর সঙ্গে তাহার পরিচয়ের কথা সে আর কাহাকেও বলিতে পারিল না।

এইভাবে এক বৎসর কাটিয়া গেল এবং প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ পরীক্ষায় সে বৃত্তি পাইল।

তখন আর "মেসে" থাকা কিছুতেই ভাল দেখায় না বুঝিয়া সে বাসা করিতে সম্মত হইল! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে বলিল, "বাসা করার বড় ঝঞ্ঝাট; ঝি-চাকরের চুরি সামলাতেই সময় কেটে যা'বে।" শুনিয়া তাহার পিতা বলিলেন, "সে কি! ছোটবৌমা এসে থাকবেন—তিনি খুব ভাল সংসারী—তা'র পর দরকার হয়, তোমার মা এসে সংসার পাতিয়ে দিয়ে যাবেন।"

তাহাই হইল। পটুলডাঙ্গা অঞ্চলে একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া নরনাথ সংসার পাতাইল এবং শ্রীমতী আসিয়া সংসার-তরণীর হাল ধরিয়া বসিল। অবনীমোহন তখন বার-কয়েক বি, এ, ফেল করার পর দেশে বসিয়া বাপের কায-কর্ম্মে সাহায্য করিতেছিল।

কলিকাতায় আসিয়া শ্রীমতী যেন আশার অধিক সুখ পাইয়াছে, কল্পনাতীত সৌভাগ্যে সে ভাগ্যবতী হইয়াছে। সে স্বামীর সব কায করিবার সুযোগ পাইয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিল এবং সকল বিষয়ে স্বামীর মনের মত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই যে চেষ্টা ফলবতী হয়, তাহা নহে। নরনাথ যখন তাহাকে নূতন করিয়া লেখাপড়া শিখাইতে ব্যস্ত হইল, তখন সে প্রমাদ গণিল। যদি বা সে সে-কাযে কিছু সাফল্য লাভ করিত—তাহাতে নরনাথই অন্তরায় হইল—ইচ্ছায় হউক, আর অনিচ্ছায় হউক, শ্রীমতী স্বামীর কাছে পড়িতে আসিলে পুস্তক ছাড়িয়া স্বামীর মুখের দিকেই চাহিয়া থাকিত। পড়ায় ভুল হইত। নরনাথ বিরক্ত হইত, এক-এক দিন রাগ করিত। শ্রীমতীর চক্ষুতে জল আসিত, কিন্তু তবুও সে স্বামীর মুখ ছাড়িয়া পুস্তকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে পারিত না।

কয় মাস এইরূপ ব্যর্থ চেষ্টার পর নরনাথ শ্রীমতীকে লেখাপড়া শিখাইবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিল। শ্রীমতীর পাঠে অমনোযোগীতা দেখিয়া নরনাথের কিন্তু তরঙ্গিণীর কথা মনে পড়িত। বোধ হয়, নিত্য-নূতন বিষয়ে শিক্ষালাভের অদম্য স্পৃহা থাকার জন্যই সুরপতি তরঙ্গিণীর প্রতি

আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারেন নাই! অন্ধকার আকাশে বিদ্যুতের মত তাহার বিরক্তি-মলিন মনের উপর একটা কথা চমকাইয়া গেল—শ্রীমতীর সঙ্গে তরঙ্গিণীর কত প্রভেদ! কিন্তু কথাটা মনে উদিত হইতে না হইতেই নরনাথ সেটাকে চাপা দিবার চেষ্টা করিল; তবে এমন চেষ্টার ফল যাহা হইবার, তাহাই হইল—সময়ে অসময়ে কথাটা মনের কোনে-কোনে উঁকি দিতে লাগিল।

শ্রীমতী কিন্তু ভাবিল, পড়া বন্ধ হইল—বাঁচা গেল। সে সমস্ত মনোযোগটুকু স্বামীর উপর দিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিল এবং বৎসরান্তে যখন তাহার একটি পুত্র হইল, তখন তাহার কাযেরও অন্ত রহিল না, সুখেরও সীমা রহিল না। একে সে কোন দিন স্বামীর সম্বন্ধে কোন রূপ সন্দেহ মনে স্থান দিবার কল্পনাও করিতে পারে নাই; তাহার পর এখন ছেলেকে লইয়া তাহার সময়ও ছিল না—কাযেই তাহার পরিপূর্ণ সুখের মধ্যে যে কোনরূপ দুঃখের ছায়া পতিত হইতে পারে, তাহা সে মনেই করিতে পারিল না, স্বামীর বিরক্তি যে উপেক্ষায় পরিণতি লাভ করিতে পারে, তাহা তাহার ধারণার অতীতই রহিয়া গেল। সে আপনার হৃদয় দিয়া স্বামীর হৃদয় বিচার করিতেই ভালবাসিত—সে বিচারে স্বামীর ত্রুটি ধরা পড়ে না।

কিন্তু সত্য সত্যই নরনাথের ব্যবহারে উপেক্ষার আভাস আসিয়া পড়িয়াছিল। সে প্রাণপণ যত্নে কর্ত্তব্যকে আঁকড়িয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছিল বটে, কিন্তু তাহার কল্পনা-প্রবণ তরুণ হৃদয়ে যে লঘু আঘাত-টুকু লাগিয়াছিল, সে তাহাকে গুরু বলিয়াই মনে করিতে আরম্ভ করিয়া-ছিল এবং একদিকে উপেক্ষার বীজটি যেমন অঙ্কুরিত হইতেছিল—আর একদিকে আকর্ষণের লতাটি ততই যেন বিচিত্র-বিকচ ফুলে শোভাময় হইয়া

উঠিতেছিল। তরঙ্গিণীর সম্বন্ধে তাহার মনে যে প্রশংসার ভাবটি এত দিন প্রচ্ছন্ন ছিল, এখন তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। নরনাথ তাহাতে আর কোন বিরুদ্ধ চেষ্টা করিল না।

এই ভাবে মাসের পর মাস কাটিল এবং নরনাথ ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ব্যবসায়ের সিংহদ্বারে চোগা-চাপকান পরিয়া উপস্থিত হইল। তখন আর পাঠের তাড়া রহিল না; সুরপতি বলিলেন, "চমৎকার হ'ল—এবার আদালত থেকে রোজ এখানে আসতে হ'বে।"

নরনাথ হাসিয়া বলিল, "রোজ?"

সুরপতি বলিলেন, "কেন, আপত্তি কি?"

তরঙ্গিণী তথায় ছিল; সে বলিল, "কেন, বাড়ীতে কি কেউ নেই যে, উনি রোজ এখানে আস্‌বেন? কেউ কি ওঁর পথ চেয়ে ব'সে থাকেন না?"

তরঙ্গিণীর কথার মধ্যে যে কোনরূপ অভিমানের আভাস ছিল বা থাকিতে পারে, সুরপতি বা নরনাথ কেহই তাহা কল্পনা করিতে পারেন নাই!

সুরপতি তাহাকে যে ভাবে দেখিতেন, সে সেই ভাবে তাঁহার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিলেও সে কেবল কৃতজ্ঞতার জন্য। সে তাঁহাকে আশ্রয়দাতা বলিয়া ভক্তিশ্রদ্ধা করিত; কিন্তু তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া তাহার হৃদয় প্রেমপুষ্পে সৌন্দর্য্যময় হইয়া উঠে নাই। সে যে ভালবাসার ভাব দেখাইত, তাহা কৃত্রিম—কেবল সুরপতিকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য। সুরপতির তাহার প্রতি ব্যবহারেও এমন আগ্রহ বা আবেগ ছিল না যে, তাহাতে তরঙ্গিণীর হৃদয়ের ভাব পরিবর্ত্তিত হইবে।

এই ভাবে দিন কাটিতেছিল। তরঙ্গিণীর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সুরপতি তাহাকে বাড়ী করিয়া দিয়াছিলেন, কিছু টাকা ও যথেষ্ট অলঙ্কারও দিয়াছিলেন—অযাচিত ভাবে সে সব পাইয়া তাহার শ্রদ্ধাই বাড়িয়া গিয়াছিল

এই সময় তরঙ্গিণী বৃন্দাবনে নরনাথকে দেখে। নরনাথ যুবক—সুকণ্ঠ, নম্র, বিদ্বান্। দেখিয়াই তাহার মন কেমন করিয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর সুরপতির সঙ্গে বন্ধুত্বহেতু নরনাথ প্রায়ই বাগান-বাড়ীতে যাওয়া-আসা করিত। এই হামেসা যাতায়াতের ফলে ঘনিষ্ঠতা জন্মিতে বিশেষ বিলম্ব হয় নাই, ফলে সেও নরনাথের সঙ্গে কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রেমের লীলাক্ষেত্র বৃন্দাবনে তাহারও অজ্ঞাতে তাহার হৃদয়ে যে ভাবের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা দিনে দিনে তিলে তিলে বর্দ্ধিত হইয়াছিল; কিন্তু এত দিন সে নিজেও তাহা লক্ষ্য করিতে পারে নাই। তাই সেদিন সে যখন সুরপতিকে বলিল, "কেন, বাড়ীতে কি কেউ নেই যে, উনি রোজ এখানে আসবেন ?"—তখন তাহার কথা যে অভিমানের উৎস হইতে উদ্গত হইয়াছিল, তাহা সে নিজেও ঠিক বুঝিতে পারে নাই।

কিন্তু সেই দিনই সে তাহা বুঝিল।

সে দিন রাত্রিতে বাড়ীতে ফিরিবার সময় সুরপতি যখন অন্য দিনেরই মত তাহাকে আদর করিতে গেলেন, তখন সে আদর তাহার কাছে বিষবৎ বোধ হইল। তিনি চলিয়া গেলে সে তাহার সন্ধানে নিজের বুকের মধ্যে সন্ধান করিয়া বুঝিল—সে নরনাথকে ভালবাসিয়াছে! সে যেন আজ শুনিতে পাইতেছে, তাহার "যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখী"!

ভাগ্যদোষে যে নারী ভালবাসার অবলম্বন না পাইয়া—ভালবাসা ফুটাইয়া তুলিতে পারে নাই, সে যদি অতর্কিতভাবে অবলম্বন পায়, তবে এক দিনে সে এক বৎসরের তৃষ্ণা অনুভব করে! তরঙ্গিণীর আজ তাহাই হইল। ভালবাসা কি, সে আজ সহসা তাহা বুঝিতে পারিল; বুঝিয়া—ভালবাসার অবলম্বনকে লাভ করিবার জন্য তাহার আবেগ-প্রবণ নারী-হৃদয় যেন সর্ব্বস্ব পণ করিল।

পুরাণের কথা তাহার মনে পড়িতে লাগিল—ভালবাসা অসাধ্য সাধন করিতে পারে, তাহার বলে অসম্ভব সম্ভব হয়। ভালবাসার বলে সাবিত্রী মৃত স্বামীকে যমালয় হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন—কিন্তু তাঁহাদের ভালবাসা, আর তার ভালবাসা! সে যে পাপের পঙ্কে পতিত হইয়াছিল; সেকি তাঁহাদের ভালবাসার সঙ্গে একসঙ্গে তাহার ভালবাসার কথা মনে করিতে পারে?

তবুও সে চেষ্টা করিবে—দেখিবে, তাহার ভালবাসা জয়লাভ করিতে পারে কি না।

সেদিন তরঙ্গিণীর পরিচারিকা আসিয়া যখন দেখিল, সে কাঁদিতেছে, তখন সে বিস্মিতা হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তরঙ্গিণী বলিল, "মাথায় যন্ত্রণা।" পরিচারিকার বিস্ময়ের যে কারণ ছিল না, তাহা নহে; কারণ পূর্ব্বে কখন সে তরঙ্গিণীকে বিষণ্ণ বা কাঁদিতে দেখে নাই। প্রস্তুবিক, তরঙ্গিণী প্রফুল্লই থাকিত। অতীত জীবনের সঙ্গে বর্ত্তমান জীবনের তুলনা করিয়া সে মনে করিত, সে যেন দুঃস্বপ্নময়

নিদ্রার পর নবীন প্রভাতে জাগিয়াছে; এখন সে সেই সব দুঃস্বপ্ন স্মরণ করিয়া উপহাসের হাসি হাসিতে পারে। বিবাহ কি, জানিতে না জানিতে সে বিধবা—তাহার পর শ্বশুরালয়ের সেই নির্য্যাতন—তাহার পর তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ পাপপথের স্বল্পকালস্থায়ী অভিজ্ঞতা—সে সকলের পর সুরপতির কাছে আশ্রয়লাভ; যেন কর্ণধারহীন তরণী আবর্ত্তসঙ্কুল নদীতে বাত্যাতাড়িত হইয়া বহু কষ্টে বন্দরে আসিয়া আশ্রয় পাইয়াছে। সে কি হাসিতে পারে না?

বিলাসে ও প্রাচুর্য্যে তাহার দিন কাটিয়াছে—অভাব তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই; সে সুরপতির দয়ায়।

কিন্তু আজ সে কাঁদিল।—আজ সে বুঝিল, মানুষ যাহাতে সুখী হয়, বুঝি তাহার ভাগ্যে তাহা লাভ করা ঘটিবে না। আজ সুখময় বর্ত্তমান জীবন তাহার কাছে যন্ত্রণাময় বলিয়া মনে হইল—ভবিষ্যতের যে জীবন সে কল্পনা করিল, তাহা লাভ করিবার জন্য সে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সেই কল্পিত ভবিষ্যৎ জীবনের কেন্দ্রস্থলে সে যাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে, তাহাকে পাইবে কি?

একবার তরঙ্গিণীর মনে হইল, নরনাথ বিবাহিত, জগতে তাহার সম্মুখে যশ, অর্থ, সাফল্য; তাহার স্ত্রীপুত্র আছে—সে কেন তাহাকে সে সব হইতে বঞ্চিত করিবে? তাহার অদৃষ্টে যাহা হইবার হইয়াছে, সে কেন আর এক জনের সংসারে অগ্নি জ্বালাইয়া দিবে?

আর সুরপতি? তিনি তাহাকে পাপের পঙ্ক হইতে তুলিয়া আনিয়া স্বগৃহে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, অভাব হইতে প্রাচুর্য্যে রাখিয়াছেন—সে কি তাঁহার কাছে বিশ্বাসহন্ত্রী হইবে? সে আপনাকে আপনি বুঝাইল, তিনি ত কেবল দয়াবশে তাহাকে আশ্রয় দেন নাই! তাঁহার অর্থের

বিনিময়ে সে কি তাঁহার মনোরঞ্জন করিবার জন্য আপনার যথাসাধ্য চেষ্টা করে নাই? তবে? আজ হিসাবনিকাশের কথা তাহার মনে পড়িল। এত কাল সে যে দয়ায় আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছে, আজ তাহা বিনিময়ের দ্রব্য বলিয়া বিবেচনা করিল।

মনের দারুণ চাঞ্চল্য লইয়া তরঙ্গিণী নিদ্রাহীন রজনী অতিবাহিত করিল। প্রভাতের আলোকবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সে যখন উঠিয়া স্নানাগারে প্রবেশ করিল, তখন সে সঙ্কল্প করিয়াছে—এ ভালবাসার তৃষা তাহাকে পূর্ণ করিতেই হইবে—বুকে এ ভালবাসাকে অতৃপ্ত রাখিয়া সে বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না—পারিবে না। সে জন্য যাহা করিতে হয়, সে করিবে।

সে জন্য সে প্রাণপণ করিবে—যেমন করিয়া হউক সাফল্য সে লাভ করিবেই।

সেদিন অপরাহ্ণে যখন নরনাথ আসিল, তখন সে-সংবাদ শুনিয়াই সে তাহার কাছে যাইতে পারিল না; একবার দর্পণের সম্মুখে যাইয়া—কেশবাস কেমন আছে দেখিয়া—মুখখানি মুছিয়া তবে আসিল।

আদালতে কায নাই বলিলেই হয়, অপরাহ্ণে নরনাথ প্রায়দিনই সুরপতির বাগানে যাইত। সুরপতির অভ্যাস ছিল—তিনি মধ্যাহ্নের পর স্নান করিতেন এবং স্নানে তাঁহার এক ঘণ্টার অধিক সময় যাইত। কোন কোন দিন নরপতি যখন আসিয়া উপস্থিত হইত, তখনও সুরপতি স্নানাগারে। তিনি স্নানাগার হইতে বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত নরনাথ কোন পুস্তক বা সংবাদ পত্র পাঠ করিত ; নহে ত—কোন দিন তরঙ্গিণী আসিলে তাহার সহিত কথা কহিত। তরঙ্গিণী সে সময়টা প্রায়ই আসিতে পারিত না ; কারণ, সে সুরপতির জন্য চা ও খাবার গুছাইতে ব্যস্ত থাকিত। যে দিন তরঙ্গিণী মনে নূতন ভাব উপলব্ধি করিল, তাহার পরদিন হইতে সে পূর্ব্বেই খাবার গুছাইয়া রাখিত এবং নরনাথ আসিলে তাহার কাছে যাইয়া চা'র ব্যবস্থা করিত, সময় সময় নরনাথের সঙ্গে একই কৌচে বসিয়া পড়িত, গল্প করিত, সাহিত্যের আলোচনা করিত। কোন দিন যদি নরনাথ না আসিত, তবে তরঙ্গিণী বিমর্ষ হইয়া পড়িত—তার যেন কিছুই ভাল লাগিত না।

দিনে দিনে ক্রমে ক্রমে তরঙ্গিণী যে তাহাকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছিল, তাহা নরনাথ বুঝিতে পারিতেছিল না, আর সে যে আকৃষ্ট হইতেছিল, তাহাও সে অনুভব করিতে পারিতেছিল না। কেবল

সে বুঝিত, একদিন যে তরঙ্গিণীকে সে ঘৃণা করিত, এখন তাহাকে তাহার মন্দ লাগা ত পরের কথা—ভালই লাগে। তরঙ্গিণীর ব্যবহারে নিঃসঙ্কোচ ভাব, কথায় সরসতা, কণ্ঠে সুস্বর—এ সব তাহার ভালই লাগিত। তাহার সঙ্গে তাহার দেহের সৌন্দর্য্য—বিশেষ নয়নের দৃষ্টি তাহাকে অধিকতর আকৃষ্ট করিত কি-না, সে বুঝিতে পারিত না। কিন্তু তরঙ্গিণী তাহাকে লক্ষ্য করিয়া যাহা বুঝিত, তাহাতে তাহার মনে সাফল্য-সম্বন্ধে সব সন্দেহ দ্রুত দূর হইয়া যাইতেছিল।

এইরূপে মাসাধিক কাল কাটিবার পর একদিন কিছু ব্যস্তভাবে নরনাথ সুরপতির বাগানে আসিল। সে দিন রাত্রিতে তাহার তথায় আহারের নিমন্ত্রণ ছিল। সে একখানি টেলিগ্রাফ হাতে করিয়া বলিতে আসিয়াছিল—সে আসিতে পারিবে না। সুরপতি তখন স্নানাগারে! তরঙ্গিণী নরনাথের আগমনসংবাদ পাইয়া আসিয়া তাহাকে দেখিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল জিজ্ঞাসা করিল—"কি হয়েছে?"

নরনাথ উত্তর করিল, আদালতে টেলিগ্রাম পেয়েছি—বাবার বড় অসুখ, আমাকে আজই রওনা হয়ে যেতে হবে। তাই বলতে এলাম।"

তরঙ্গিণী যেন একটা অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত আঘাত পাইল, যেন একটানা স্রোতে যাইতে যাইতে নৌকা সহসা ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়াছে!

নরনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "রাজা বুঝি স্নান করতে গেছেন?"

"হাঁ।"

"আমি আর দেরি করতে পারব না—এ কথাটা তাঁ'কে যেন জানান হয়।"

তরঙ্গিণী কিছুক্ষণ একদৃষ্টে নরনাথের মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া অত্যন্ত

ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "বাড়ীতে পৌঁছেই খবর দেবেন। খবর পাবার জন্য আমি যে উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকব, তা' আপনি বিশ্বাস করেন কি না জানি না; কিন্তু সেটা সত্য।"

"আচ্ছা"—বলিয়া নরনাথ চলিয়া গেল। তাহার মনে হইল, তাহাকে অনুরোধ করিবার সময় তরঙ্গিণীর চক্ষু যেন অশ্রুতে আর্দ্র হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু তখন সে কথার অধিক আলোচনার অবসর তাহার ছিল না।

বাসায় আসিয়া সে যখন শ্রীমতীকে সে সংবাদ দিল, তখন শ্রীমতী বলিল, সে-ও তাহার সঙ্গে যাইবে।

নরনাথ বলিল, "একা তুমি হ'লে হ'ত। খোকা রয়েছে—ট্রেণের আর তিন ঘণ্টা সময় আছে। আমি অবনীকে টেলিগ্রাফ করছি, সে কা'ল এসে তোমাকে নিয়ে যা'বে। তুমি সব গুছিয়ে নাও। আজ আমি যাই।"

এ ব্যবস্থা শ্রীমতীর মনের মত না হইলেও সে স্বামীর কথায় দ্বিরুক্তি করিল না।

নরনাথ বাড়ী গেল—বাড়ীর ঘাটে নৌকা লাগাইতে হইলে গ্রামের শ্মশান অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। তথায় লোকসমাগম দেখিয়া সে নৌকা ভিড়াইল। তখন বিশ্বনাথের শব চিতায় তুলিবার আয়োজন হইতেছিল। নরনাথ পিতার সৎকারের সাহায্য করিল—পিতার সহিত তাহার শেষ সাক্ষাৎ হইল না।

অবনীমোহন যাইয়া শ্রীমতীকে নরনাথের বাড়ী আনিল।

তাহার পর কয় ভ্রাতায় পিতার শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে পরামর্শ হইল। ক্রিয়াদি জাঁকাইয়া করিতে পিতার কত আনন্দ ছিল, তাহা নরনাথ

জানিত এবং জানিত বলিয়া ভ্রাতাদিগকে বলিল—"বাবা ভাল ক'রে শ্রাদ্ধ করতে ভালবাসতেন। যা'তে কাযটা তাঁর মনের মতন হয়, তা'রই ব্যবস্থা কর।"

শ্রাদ্ধের সময় দীননাথ আসিয়া কর্ত্তৃত্ব করিলেন—তিনি কাযকর্ম্মে পাকা লোক, তাঁহার কর্ত্তৃত্বে কার্য্য সুসম্পন্ন হইল।

কায শেষ করিয়া সম্পত্তির ভার হরনাথের উপর দিয়া ও বিমাতাকে সংসারের কর্ত্রী রাখিয়া নরনাথ সস্ত্রীক কলিকাতায় ফিরিয়া গেল।

তাহার পিতৃবিয়োগের সংবাদ পাইয়াই সুরপতি তাহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন এবং তদবধি উভয়ের মধ্যে পত্রব্যবহার ছিল। শ্রাদ্ধের সময় সুরপতির লোক তাঁহার অবস্থার উপযুক্ত "লৌকিকতা" লইয়া নরনাথের গৃহে গিয়াছিল।

কলিকাতায় ফিরিয়া প্রথম দিনই আদালত হইয়া নরনাথ সুরপতির বাগানে গেল। যাইবার দিন সে তরঙ্গিণীকে যেমন বিষণ্ন দেখিয়া গিয়াছিল, আজ তাহাকে তেমনই আনন্দোৎফুল্ল দেখিল। সে নরনাথকে বলিল, "মনে হচ্ছিল—আপনি কত দিন বাড়ী গেছেন! যেন কত [illegible]! কেন এমন হয় বলুন ত ?"

নরনাথ বলিল. "এবার ত অনেক দিনই বাড়ী ছিলাম—এক মাসের বেশী।"

"এক মাস—ঠিক মনে হচ্ছিল, কত বৎসর!"

নরনাথ এ কথার কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইল না।

তরঙ্গিণী বলিল, "বোধ হয় আপনাকে আমার খুব ভাল লাগে ব'লে। কিন্তু কেন বলুন দেখি?"

"বোধ হয়, রাজা আমাকে স্নেহ করেন বলে।"

"না। বোধ হয়, জন্মান্তরে আমার সঙ্গে আপনার কোনরূপ স্নেহ-ভালবাসার সম্বন্ধ ছিল, আর সে জন্মে আমার পিপাসা মেটেনি—সেই পিপাসা জন্মান্তরেও আমার অনুসরণ ক'রে এসেছে। যেন কবির সেই অনুভূতি—

"জনম জনম হম রূপ নেহারনু,
নয়ন না তিরপিত ভেল।"

সে দিন গৃহে ফিরিবার সময় নরনাথ মনে করিতে লাগিল, তরঙ্গিণীর তাহাকে ভাল লাগে কেন? ভাল লাগার সঙ্গে কি ভালবাসার কোন সম্বন্ধ আছে? ভাবিয়া নরনাথ শিহরিয়া উঠিল।

সে যখন গৃহে ফিরিল, তখন সন্ধ্যা হয় হয়। সমস্ত দিন এক মাসের অনুপস্থিতি-জনিত বিশৃঙ্খলা ও আবর্জ্জনা দূর করিয়া—"সংসার পাতাইয়া" শ্রান্ত শ্রীমতী কাপড় কাচিতে যাইবার পূর্ব্বে চুলটা আঁচড়াইয়া লইতে-ছিল। দীর্ঘ এক মাস কাল তৈলসম্পর্কশূন্য কেশরাশি তখনও পূর্ব্বশ্রী ফিরিয়া পায় নাই—বিশেষ তাহাদের প্রতি শ্রীমতীর কখনই অধিক মনোযোগ ছিল না।

সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া নরনাথ শ্রীমতীকে দেখিল—তরঙ্গিণীকে

দেখিয়া আসিবার পর সে শ্রীমতীকে দেখিল—শ্রীমতীর রূপের অভাবের কথা সে শুনিয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু এতদিন কখন তাহা তাহার চক্ষুতে পড়ে নাই। আজ যেন সে প্রথম তাহা লক্ষ্য করিল।

স্বামীকে দেখিয়া শ্রীমতী ব্যস্ত হইয়া চিরুণী রাখিল—চুলগুলি জড়াইয়া একটা খোঁপা করিয়া বলিল, "আজ যে এত সকাল-সকাল এলে ?"

নরনাথ যেন অন্যমনস্কভাবে বলিল, "এলাম।"

"তুমি হাতে-মুখে জল দাও, আমি কাপড়টা কেচে আসি—এসে খাবার দেব; বড্ড ধুলো ঘাঁটতে হয়েছে। বাড়ীঘর যেরকম হয়ে ছিল !"

বাস্তবিক একদিনে শ্রীমতী ঘরের চেহারা ফিরাইয়া দিয়াছিল। সেদিকে কিন্তু আজ নরনাথের দৃষ্টি পড়িল না—সে জন্য শ্রীমতীকে কত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, সে কথা সে ভাবিল না। সে আজ অন্য চিন্তায় তন্ময় ছিল। সে কোন দিন মনের বলের অনুশীলন করে নাই—কেবল লোকনিন্দার ভয় তাহাকে বিপথে যাইতে দেয় নাই। মনের বলের অভাবেই সে তরঙ্গিণীর সঙ্গে সুরপতির সম্বন্ধ জানিয়াও সুরপতির সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারে নাই, মনের বলের অভাবেই সে তরঙ্গিণীর সঙ্গে কথা কহিতে ও ক্রমে তাহার সহিত মিলামিশা করিতে অস্বীকার করিতে পারে নাই। তাহার মনের বলের অভাব বুঝিতে পারিয়াই—তাহার দৌর্ব্বল্যের পরিচয় পাইয়াই তরঙ্গিণী আজ তাহাকে বলিতে সাহস করিয়াছিল, তাহাকে তাহার ভাল লাগে। আর সেই বলের অভাবেই সে আজ তরঙ্গিণীর সঙ্গে তাহার স্ত্রীর তুলনা করিয়াছিল—ভুলিয়া গিয়াছিল, এই স্ত্রী সত্যসত্যই গৃহলক্ষ্মীরূপে তাহার গৃহে

আবির্ভূতা না হইলে আজ তাহার পক্ষে সাফল্য ও সম্মান লাভ করা দুষ্কর হইত—হয়ত দারিদ্র্যের অনলে তাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষাও দগ্ধ হইয়া যাইত।

কিন্তু সে-সব কথা আজ আর নরনাথের মনে হইল না; আজ তাহার মন অন্য চিন্তায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। যখন শ্রীমতী খাবার লইয়া আসিল, তখন তাহার মনে হইল, তরঙ্গিণী যখন তাহাদের জন্য চা ঢালিয়া দেয়, তখন তাহার অঙ্গভঙ্গীতে কি কমনীয়তা প্রকাশ পায়—তাহার মুখে কেমন প্রফুল্ল ভাব দেখা যায়,—তাহার দৃষ্টিতে কেমন দীপ্তি দেখা দেয়!

সেই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে নরনাথ অত্যন্ত অন্যমনস্ক হইল। যে চিন্তা তাহার মনের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল, সে তাহাকে দূর করিয়া দিবার চেষ্টা না করিয়া সাদরে আশ্রয়ই দিল।

বিষবৃক্ষের বীজ উর্ব্বর ক্ষেত্রেই পতিত হইয়াছিল—অচিরে তাহা বিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। বিবর্দ্ধিত হইবার যথেষ্ট কারণও ছিল। সুরপতি সত্য সত্যই নরনাথকে শ্রদ্ধা করিতেন। তরঙ্গিণীর সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠতায় তিনি কোনরূপ সন্দেহ করেন নাই; এবং তরঙ্গিণীকেও যে সন্দেহ করিতে হয়, তাহা তিনি আর মনে করিতেন না—তাহার সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধটা এমনই দাঁড়াইয়াছিল। যখন তরঙ্গিণী বুঝিতে পারিল, নরনাথের মন হেলিয়াছে, তখন সে তাহাকে আকৃষ্ট করিবার জন্য আরও চেষ্টা করিতে লাগিল। সে তাহার ব্যবহারে মাধুরী ও হাসি-চাহনীতে সৌন্দর্য্য মিশাইয়া কেবল নরনাথকে আকৃষ্ট করিতে লাগিল, আর নরনাথও যেন কতকটা ইচ্ছায় আকৃষ্ট হইতে লাগিল।

পথ পিচ্ছিল—সে পথে একবার দাঁড়াইলে কেবলই অগ্রসর হইতে হয়। নরনাথ দিন-দিন মোহাবিষ্ট হইতে লাগিল। তাহার পর এক দিন—সেদিন সুরপতি বৈষয়িক কার্য্যে বাগানে আসিতে পারেন নাই—নরনাথ আসিলে তরঙ্গিণী তাহার সঙ্গে বৈষ্ণব-কবিতার আলোচনা করিতে করিতে বলিল, "সেই গানটা করুন না,—"কি আর বলিব আমি—"

নরনাথ গাহিল। তাহার গান শেষ হইলে তরঙ্গিণী বিহ্বল কটাক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনাকে দেখার পর থেকে আমার

কেবলই মনে হয়, জন্ম-জন্ম আমি আমার বুকে আপনার জন্য তৃষ্ণা নিয়ে চলেছি। যেন কত আরাধনার পর আপনাকে পেয়েছি। কিন্তু—”

বলিতে বলিতে সহসা সে আবেগ ভরে নরনাথের হাত ধরিয়া বলিল, “ঠিক বলুন—আপনাকে পাব কি ?”

নরনাথের মনের মধ্যে যে সংস্কার বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছিল, বাসনার দারুণ আঘাতে তাহা যেন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। নরনাথ ধরা দিল।

নরনাথ ধরা দিবার পর কি হইল ?—সংযমের বন্ধন একবার বিচ্ছিন্ন হইলে, উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবল বন্যার মতই প্রবাহিত হয়—তাহাতে সংস্কার, শিক্ষা, চরিত্র সবই ভাসিয়া যায়, শেষে লজ্জাও আর থাকে না।······

নরনাথের সঙ্গে তরঙ্গিণীর সম্বন্ধ কিসে পরিণত হইয়াছে, সুরপতির ন্যায় অতি বিচক্ষণ এবং ‘পাকা’ লোকের কাছে—তাহা অধিক দিন গোপন রহিল না। মনের মধ্যে সন্দেহের ছায়াপাত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অত্যন্ত সতর্কতার সহিত সুরপতি ব্যাপারটা লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। লক্ষ্য করিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহার পক্ষে সত্য ধরিয়া ফেলিতে আর বিলম্ব হইল না।

কিন্তু তিনি কোনরূপ উগ্র ব্যবস্থা করিলেন না। তিনি বার্দ্ধক্যের সোপানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন—মোহ কাটিয়া যাইতেছিল, কেবল অভ্যাস হেতু কাটিয়া যায় নাই। তিনি যেন আপনাকে মুক্ত অনুভব করিলেন। পুরাতন জীবন—মলিন বস্ত্রের মত ত্যাগ করিতে পারিবেন মনে করিয়া স্বস্তি বোধ করিলেন। তিনি যে পথ গ্রহণ করিলেন, তাহাও মৌলিক বটে। তাহাতে ক্রোধের উচ্ছ্বাস ছিল না।

একদিন আদালতে নরনাথ সুরপতির একখানি পত্র পাইল ঃ—

"নরনাথবাবু, তরঙ্গিণীর সঙ্গে আপনার নবসংস্থাপিত সম্বন্ধের কথা আমি জানিতে পারিয়াছি। সম্বন্ধটা হয়ত খুব নূতন নহে; তবে নূতন যে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

"তরঙ্গিণীকে যেদিন তাহার ভ্রাতার মুখ চাহিয়া আনিয়াছিলাম, সেই দিন হইতেই মনে ভাবিয়াছি, আমার অবর্ত্তমানে তাহার অবস্থা কি হইবে, এবং তাহাই ভাবিয়া তাহার জন্য যথাসাধ্য ব্যবস্থাও করিয়াছি। এখন আপনার নির্ব্বুদ্ধিতায় আপনি হাসিতেছি। সে যে পথ চিনিয়াছিল, তাহাতে তাহার উপায় সে আপনি করিতে পারে—করিয়াছেও বটে। আপনি যে এখন তাহার ভার লইয়া আমাকে অব্যাহতি দিয়াছেন, ইহাতে আমি আপনার কাছে একান্তই কৃতজ্ঞ এবং এই পত্রে সেই কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বিদায় লইতেছি।

"বলিবার আরও একটি কথা আছে—অতঃপর আমার গৃহে আর তরঙ্গিণীর স্থান হইবে না। আপনি যখন তাহার ভার লইয়াছেন, তখন সে ব্যবস্থা করিবেন। আমার পরিচারকেরা আজই বাগানবাড়ী বন্ধ করিয়া আসিবে।"

পত্র পাইয়া নরনাথের মাথা ঘুরিয়া গেল। কিন্তু আর বাগানবাড়ীতে যাইতে তাহার সাহস হইল না। তাই সে বাড়ী গেল এবং যাইয়া শুইয়া পড়িল। তাহার অবস্থা দেখিয়া শ্রীমতী শঙ্কিতা হইয়া পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে?" কিন্তু সে কোন সদুত্তর পাইল না।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল—"রাজবাড়ীর মোটর এসেছে, তা'তে কে এসেছেন।"

নরনাথ তাড়াতাড়ি নামিয়া গেল; দেখিল—মোটরে বসিয়া তরঙ্গিণী!

নরনাথ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তরঙ্গিণী বলিল, "এস।"

সে আহ্বান উপেক্ষা করিবার শক্তি তখন নরনাথের ছিল না। সে ভৃত্যকে তাহার জামা, চাকর ও এলবার্ট জুতা আনিতে বলিল,—সে তাহা আনিলে, পরিধান করিয়া মোটরে উঠিয়া বসিল।

তরঙ্গিণী চালককে বলিল, "চল।"

চালক জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায়?"

"বাড়ী।"

"রাজা-সাহেবের হুকুম, সে-বাড়ীতে আপনাকে আর নিয়ে যাওয়া হ'বে না।"

তরঙ্গিণী উগ্রভাবে উত্তর দিল, "কেন, আমার কি কোন বাড়ী নেই?"

চালক মোটর চালাইল।

ভৃত্য উপরে যাইয়া শ্রীমতীকে সব কথা বলিলে, শ্রীমতী ব্যাপারটা যেন ঠিক বুঝিতেই পারিল না।

অনেক রাত্রিতে নরনাথ যখন বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল, তখন শ্রীমতী তাহাকে ব্যাপারটা কি জিজ্ঞসা করিলে, নরনাথ বলিল, "রাজবাড়ীতে ত রোজই যাই—কিছু কি নতুন দেখলে?"

শ্রীমতী তাহার প্রশ্নে স্বামীর এই বিরক্তির কারণ খুঁজিয়া পাইল না, বলিল, "গাড়ীতে নাকি একজন স্ত্রীলোক ছিলেন?"

"ছিলেন—রাজবাড়ীর লোক।"

"রাজবাড়ীর লোক—স্ত্রীলোক ?"

"হ্যাঁ। সবাই ত আর পাড়াগেঁয়ে নয়, যে অন্দরে ঘোমটা টেনেই বসে থাকবে"

"তবে—?"

"ও সব তুমি বুঝবে না।"

স্বামীর ব্যবহারে ব্যথিতা শ্রীমতী আর কোন কথা বলিল না। কিন্তু তাহার মনে যেমন ব্যথা বাজিল, তেমনই সন্দেহ স্থান পাইল। সে পার্শ্বের ঘরে যাইয়া খোকাকে বুকে তুলিয়া লইল—তাহার দুই চক্ষু, ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল।

মোটর তরঙ্গিণীকে ও নরনাথকে রাজার বাগানবাড়ীর পার্শ্বে তরঙ্গিণীর গৃহে দিয়া চলিয়া গেল। তাহারা দেখিল—বাগানবাড়ীতে দ্বার-জানালা সব বন্ধ—আলো জ্বলে নাই। তরঙ্গিণীর পরিচারিকাদ্বয় পূর্ব্বেই তাহার গৃহে আসিয়াছিল ; তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিয়া রাজার লোক বাড়ীতে চাবি বন্ধ করিয়াছিল—কেবল দুই জন দ্বারবান্ ছিল।

বাড়ীতে আসিয়া তরঙ্গিণী নরনাথকে একখানি পত্র দেখাইল সুরপতি তাহাঁকে লিখিয়াছেন :—

তরঙ্গিণী,

"বিদেশী লেখকরা যিনি যাহাই কেন বলুক না—এত দিনে আমাদের শাস্ত্রকারদিগের কথার যথার্থ্য উপলব্ধি করিলাম—স্ত্রীলোক একবার

পাপের পথে পা দিলে সে আর পুণ্যপথে স্থির থাকে না। তাই আমাদের শাস্ত্রের এতখানি কঠোর বিধান।

"আমি তোমার হিত চিন্তাই করিয়াছি। যে আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া আমি তোমার জন্য অনেক ত্যাগ সহিয়াছি—অনেক নিন্দা সহ্য করিয়াছি, তুমি সে আকর্ষণের উপযুক্ত নহ। সেই জন্য আজ যখন আমার ভুল ভাঙ্গিয়াছে, তখন তোমাকে বলিতে হইতেছে—আমার গৃহে আর তোমার স্থান হইবে না। আমার কর্ম্মচারি যাইতেছেন। তুমি যেখানে যাইতে চাহ, মোটর তোমাকে তথায় দিয়া আসিবে। ইতি"

নরনাথ পত্রখানি পড়িল। এতক্ষণ সে একটি কথাও বলে নাই—এখনও বলিল না।

তরঙ্গিণী বলিল, "তুমি ভাবছ কেন? আমি ত মনে করছি, আজ আমাদের মুক্তি—আজ আমরা আর আমাদের ভালবাসা গোপন করতে বাধ্য নই; জগতের সম্মুখে তা ব্যক্ত ক'রে বলছি—যেমন ক'রে বসন্তের বাতাস জানিয়ে দেয়, সে ফুলকে ভালবাসে।" বলিতে বলিতে সহসা বাহু দিয়া তাহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া তাহার পার্শ্বে বসিয়া তরঙ্গিণী পুনরায় বলিল, "তুমি কিছু ভেব না—ভালবাসায় কিছু অভাব থাকে না।"

ইহার পর হইতে নরনাথ প্রতিদিন তরঙ্গিণীর কাছে যাইতে লাগিল। সে আদালতের ফেরৎ তথায় যাইত—বাড়ী ফিরিতে বিলম্ব হইত। শ্রীমতী ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে যে উত্তর দিত, তাহাতে শ্রীমতী ক্রমে আর সন্তুষ্ট থাকিতে পারিত না। স্বামীর ব্যবহারে পরিবর্ত্তনও অধিক দিন শ্রীমতীর কাছে গোপন রহিল না। এমন অবস্থায় প্রকৃত কথা স্ত্রীর কাছে দীর্ঘকাল গোপন থাকিতে পারে না—স্ত্রীর সন্দেহ ক্রমেই দৃঢ় হয়।

শ্রীমতী কিন্তু তাহার দুঃখের কথা কাহাকেও বলিল না। সে তাহা গোপন রাখিয়া আপনি কষ্ট ভোগ করিতে লাগিল। এই সময় হরনাথ একবার একটা কাযে কলিকাতায় আসিল এবং ভ্রাতার ব্যবহারে তাহার বিশেষ সন্দেহ হইল। ভাই একে বিদ্বান—তাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা উপার্জ্জনক্ষম, কাজেই হরনাথ সাহস করিয়া নরনাথকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না; কিন্তু দেশে ফিরিয়া একদিন দীননাথ ঘোষের বাড়ীতে যাইয়া অবনীমোহনের কাছে আপনার সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিল।

কথাটায় বিশ্বাস করিতে অবনীমোহনের প্রবৃত্তি হইল না—কারণ সে নরনাথকে অসাধারণ শ্রদ্ধা করিত। কিন্তু এ কথা শুনিয়া সে আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না—কলিকাতায় চলিয়া গেল।

কলিকাতায় আসিয়া অবনীমোহন ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিয়া বিশেষ কিছু অবগত হইতে পারিল না। শ্রীমতী ভ্রাতার কাছে স্বামীর প্রতি কোন সন্দেহের কথা প্রকাশ করিল না। তখন অবনীমোহন স্বয়ং অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। সুরপতির সহিত নরনাথের ঘনিষ্ঠতার কথা সে জানিত। সে প্রথমে তথায় সন্ধান লইল এবং সেই সন্দেহের সূত্র ধরিয়া সত্যে উপনীত হইতে তাহার একটুও বিলম্ব হইল না।

সকল কথা অবগত হইয়া সে যেন স্তম্ভিত হইল! ভগিনীর এই দুর্ভাগ্যে সে যত না ব্যথিত হইল, নরনাথের অধঃপতনে তত ব্যথিত হইল। তবে কি মানুষকে বিশ্বাস করা যায় না—বিশ্বাস করিবার উপায় নাই! সে যে নরনাথকে দেবতার মত ভক্তি করিয়া আসিয়াছে; নরনাথের সহিত ভগিনীর বিবাহ হওয়ায় ভগিনীকে অসাধারণ ভাগ্যবতী বলিয়া বিবেচনা করিয়াছে! আজ একি! বিদ্যা, বুদ্ধি, সংস্কার—কিছুতেই কি মানুষকে সংযমের পথে অবিচলিত রাখা যায় না?

অবনীমোহন স্থির থাকিতে পারিল না—নরনাথের এই কাযের প্রতিবাদ করিল। নরনাথ বুঝিল, ব্যাপারটা আর গোপন রাখা যাইবে না—তাহার লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। সে তখন যুক্তিতর্কে অবনীমোহনকে পরাভূত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

কিন্তু অবনীমোহনের অব্যর্থ সংস্কারের কাছে নরনাথের যুক্তি নিস্ফল হইল। অবনীমোহন কিছুতেই নরনাথের কার্য্যের সমর্থন করিতে পারিল না।

শেষে নরনাথ গম্ভীর ভাবে বলিল,"ওসব তুমি বুঝ্‌তে পারবে না—ও দর্শনের কথা, মনস্তত্বের বিষয়। বিশেষ এ সম্বন্ধে তোমার সত্য দেখবার পথে আরও একটা অন্তরায়—তুমি তোমার ভগিনীর স্বার্থটাই বড় ক'রে দেখছ ?"

অবনীমোহন একটু উগ্রভাবেই বলিল, "আমার পরম ভাগ্য যে আমি দর্শন পড়িনি—মনস্তত্বের আলোচনা ক'রে মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিই নি—নিজের নিজ স্বজনগণের সর্ব্বনাশ করি নি ; চরিত্র হারিয়ে পশু হই নি। আর যদি এ কথাই সত্য হয় যে, আমি আমার ভগিনীর স্বার্থটাই বড় ক'রে দেখছি, তবে তাতে আমি গর্ব্বিত বই লজ্জিত নই। কেন না, দর্শন পড়ে আমি ভগিনীর বা পত্নীর প্রতি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইনি।"

ক্রমে দুইজনে কথা কাটাকাটি হইতে-হইতে দুই একটা অপ্রিয় কথাও উঠিল। শেষে অবনীমোহন বলিল, "আমার দুঃখ এই যে, আমিই জিদ করেছিলাম, শ্রীমতীর সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবই। বাবাও যখন টাকার কথা ভেবে একটু ইতস্ততঃ করছিলেন, তখনও আমিই বেশী জিদ করেছিলাম।"

নরনাথ বলিল, "অর্থাৎ যখন তোমারা টাকা দিয়েছ, তখন আমি তোমাদের ক্রীতদাস ?"

"না, সে কথা আমরা একবারও মনে করিনি। আমরা তখন মনে করেছিলাম, তোমার সঙ্গে শ্রীমতীর বিয়ে দিয়ে আমরা কৃতার্থ হলাম। তাই মনে ক'রেছিলাম ব'লেই আজ তোমার এ ব্যবহারে এত ব্যথা পাচ্ছি। কিন্তু কর্ত্তব্যজ্ঞান কি তোমার এতটুকুও নেই ?"

"অর্থাৎ টাকার বদলে আমাকে তোমার ভগিনীকে ভালবাসতেই হবে ?"

অবনীমোহন কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই দ্বারের পার্শ্ব হইতে শ্রীমতী ডাকিল, "দাদা !"

শ্রীমতী দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সব শুনিয়াছিল—ক্রমে ব্যাপারটা সঙ্গীন হইয়া উঠিতেছে বুঝিয়া সে ভ্রাতাকে ডাকিল।

অবনীমোহন ভগিনীর কাছে যাইলে শ্রীমতী বলিল, "দাদা, তুমি আজই বাড়ী যাও। আমার জন্যে তুমি ঝগড়া করো না। আমি বুঝেছি, অদৃষ্ট ছাড়া পথ নেই।"

অবনীমোহন চুপ করিয়া রহিল।

শ্রীমতী বলিল, "দাদা, কেবল একটা অনুরোধ—হয়ত আমার শেষ অনুরোধ, মা'কে আর বাবাকে এ কথা বলো না। তাঁ'রা শুন্‌লে বড় কষ্ট পাবেন।" বলিবার সময় শ্রীমতী আর আপনাকে সামলাইতে পারিল না—তাহার দুই চক্ষু হইতে দুই ফোঁটা জল টপ টপ করিয়া ঝরিয়া পড়িল। সেই দুই ফোঁটার পর আরও দুই ফোঁটা অশ্রু ঝরিবার পূর্ব্বেই সে আপনাকে সামলাইয়া লইবার চেষ্টায় মুখ নত করিয়া ক্রোড়ের শিশুর মুখ চুম্বন করিল। কিন্তু সে আর আপনাকে সামলাইতে পারিল

না—পার্শ্বের ঘরে যাইয়া ছেলেকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া দারুণ বেদনায় কাঁদিতে লাগিল।

অবনীমোহনের নয়নও অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

ছেলেকে বুকে লইয়া বুকের জ্বালায় অনেকক্ষণ কাঁদিয়া শ্রীমতী যখন আপনাকে একটু শান্ত করিতে পারিল, তখন উঠিয়া অশ্রু-কলুষিত মুখ ধৌত করিয়া সে স্বামীর ও ভ্রাতার জন্য জলখাবার গুছাইয়া লইয়া গেল। অবনীমোহন বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল। নরনাথ তখন বাহির হইয়া গিয়াছে।

অবনীমোহন বলিল, "শ্রীমতী, তুই কি আমার সঙ্গে যাবি?"

শ্রীমতী বলিল, "না।"

"এখানে থাকার চেয়ে—"

"আমি এখানেই থাকব, দাদা।"

অবনীমোহন আর কোন কথা বলিল না। রাত্রির গাড়ী ধরিবার জন্য অবনীমোহন যখন বেদনাকাতর হৃদয়ে অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে যাত্রা করিল, তখনও নরনাথ ফিরিয়া আসে নাই।

লজ্জার আড়াল যখন ঘুচিয়া গেল, তখন সঙ্কোচও আর রহিল না। কাযেই তরঙ্গিণীর কাছেই নরনাথের অধিক সময় ব্যয়িত হইতে লাগিল।

তরঙ্গিণী প্রথমে বলিয়াছিল বটে—ভালবাসায় কোন অভাবই থাকিবে না; কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তাহার সে ভাব আর রহিল না। সুরপতি তাহাকে প্রাচুর্য্যে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছিলেন—সে রাণীর হালেই বাস করিত; সংসারের কোন চিন্তা তাহার দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইতে সাহস করিত না। আর এখন? এখন প্রাচুর্য্যের পরিবর্ত্তে অভাবই দিন-দিন তাহার দিকে অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা জানাইতে লাগিল। অভাবের স্বরূপ সে যে কখন জানে নাই, তাহা নহে! তাই পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া সে যেন শিহরিয়া উঠিতে লাগিল।

ইংরাজ-কবি বায়রণ বলিয়াছেন, স্ত্রীলোক যে প্রথম ভালবাসে, সে তাহার প্রণয়-পাত্রকে; তাহার পর সে ভালবাসে তাহার ভালবাসাকে। কাযেই তখন আর প্রণয়পাত্র পরিবর্ত্তনে তাহার দ্বিধা থাকে না। একবারই ভালবাসা সম্ভব—যদি সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয়, ভালবাসার স্থানে যদি লালসা আসিয়া দাঁড়ায় বা প্রয়োজন বোধ সে স্থান অধিকার করে, তবে আর নারী ত্যাগ স্বীকার করিতে আগ্রহ অনুভব করে না।

তরঙ্গিণীরও তাহাই হইয়াছিল। সে-ভাব পুষ্ট করিতে সাহায্য

করিতেছিল, তাহার পরিচারিকারা। তাহাদের মুখে তরঙ্গিণীর স্থরপতির গৃহত্যাগের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল এবং আরও কোন কোন পক্ষ হইতে তাহাকে অভাবের অধিকারের বাহিরে আদরে রাখিবার প্রস্তাবও যে না আসিতেছিল তাহা নহে।

তরঙ্গিণী প্রথমে সে সব প্রস্তাব কানে তুলে নাই—কিন্তু ক্রমে সে সব মনে মনে তোলাপাড়া করিতে হইল। আর সঙ্গে সঙ্গে নরনাথের প্রতি তাহার আকর্ষণের—মোহের প্রাবল্য হ্রাস পাইতে লাগিল। প্রথম প্রথম মোহাবিষ্ট নরনাথ তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না বটে, কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল ততই তরঙ্গিণীর অনাদর তাহার মোহান্ধ নয়নেও ধরা পড়িতে বাকি রহিল না। কিন্তু তখনও নরনাথের মোহ কাটিয়া যায় নাই—সে তখনও তরঙ্গিণীর প্রতি আকৃষ্ট—সে যেন নেশার আকর্ষণ ও উত্তেজনা! কাযেই তরঙ্গিণীর ভাবান্তরে সে ব্যথিত হইলেও তাহার আকর্ষণ শেষ হইয়া গেল না। মোহ তাহার কাটিল না।

ফলে দাঁড়াইল, নরনাথ তাহার সর্ব্বস্ব দিয়া তরঙ্গিণীর সন্তোষ ক্রয় করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে লাগিল। সে বুঝিতে পারিল না, অর্থই যে স্থানে ভালবাসার মূল্য, সে স্থানে তাহার সর্ব্বস্ব কত সামান্য! তরঙ্গিণী যে-"সর্ব্বস্ব" ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল, তাহার তুলনায় সামান্য গৃহস্থ—আদালতের এক জন নূতন উকিল সে, তাহার সম্বল কত অল্প! নরনাথ যতই তাহার সামান্য অর্থ তরঙ্গিণীর জন্য ব্যয় করিতে লাগিল, ততই সংসারের অভাব প্রবল হইতে লাগিল; অথচ তাহা তুচ্ছ মনে করিয়া তরঙ্গিণী ঘৃণার হাসি হাসিত—কারণ, সে উপহার সে তুলনা করিত স্থরপতির মূল্যবান উপহারের সঙ্গে—আর তুলনা করিলেই নরনাথের উপহার যৎসামান্য—তুচ্ছ বলিয়া মনে হইত।

সময় সময় কলিকাতায় আসিয়া হরনাথ নরনাথের সংসারের অভাব লক্ষ্য করিত এবং যথাসম্ভব অর্থ গৃহ হইতে আনিয়া শ্রীমতীকে দিয়া যাইত। কারণ, নরনাথ সব ভুলিলেও তাহার ভ্রাতারা ভুলিতে পারে নাই যে, তাহারা যে আজ পথের ভিখারী না হইয়া স্বচ্ছল অবস্থায় দিনাতিপাত করিতেছে, সে কেবল শ্রীমতীর জন্যই। তাহারা ভুলিতে পারে নাই, দীনু ঘোষের এই কালো মেয়েই তাহাদের অভাবের অন্ধকার ঘরে স্বচ্ছলতার আলো আনিয়াছে! অথচ সে যে সে গৃহে সকলের স্নেহ অর্জ্জন করিয়াছে, সে তাহার পিত্রালয়ের অর্থে নহে, পরন্তু তাহার আপনার বিনয়নম্র ব্যবহারে। সে কথা ভুলিতে পারে নাই বলিয়াই তাহারা শ্রীমতীর প্রতি নরনাথের ব্যবহারে অত্যন্ত ব্যথিত হইত। কিন্তু যে ভাই বিদ্যায় বড়, যশে বড়, মানে বড়,—তাহার ব্যবহারের প্রতিবাদ করিতেও তাহারা সাহস করিত না; এমন কি লোকের কাছে তাহার প্রকৃতি-পরিবর্ত্তনের কথা প্রকাশ করিতেও লজ্জানুভব করিত।

এইরূপে মাসের পর মাস কাটিয়া যাইতে লাগিল—শ্রীমতীর রূপহীন দেহে শীর্ণতাহেতু রূপের অভাব আরও পরিলক্ষিত হইতে লাগিল—মনের মধ্যে যে বেদনবহ্নি ছিল, তাহারই তাপে সে যেন ঝলসাইয়া যাইতেছিল; সে কেবল মনে করিত, এ জীবন যায় না কেন?

এমনি করিয়া মাসের পর মাস কাটিয়া বৎসর ফিরিয়া আসিল। কলিকাতার অলিতে-গলিতে ব্যাপক ভাবে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা গেল।

এই সময় এক দিন সকালে উঠিয়া নরনাথের মনে হইল, মাথাটায় একটু যন্ত্রণা অনুভূত হইতেছে, শরীরটাও ভারী। সেদিন আদালতে তাহার একটা মোকর্দ্দমা ছিল। দীননাথের প্রজা ও খাতকদিগের

কোন মোকর্দ্দমা হাইকোর্ট পর্য্যন্ত গড়াইলে তিনি তাহাদিগকে নরনাথকে উকিল দিতে উপদেশ দিতেন। এও সেইরূপ একজনের মোকর্দ্দমা। সেদিন আহারে নরনাথের রুচি হইল না—সে না খাইয়া আদালতে গেল।

আদালতে প্রথম কাছারিতেই মোকর্দ্দমা হইয়া গেল। নরনাথ মোকর্দ্দমায় জিতিয়া আনন্দোৎফুল্ল হইল। সে যখন উকিল-লাইব্রেরীতে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার মাথার যন্ত্রণা অত্যন্ত বাড়িয়াছে—সে আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিল না। বাড়ী ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া একখানি গাড়ী ভাড়া করিল। কিন্তু মোহ এমনি মজার জিনিস যে, নরনাথ বাড়ীর দিকে না গিয়া গাড়োয়ানকে তরঙ্গিণীর বাড়ীর ঠিকানায় চলিতে হুকুম করিল। তরঙ্গিণী তখন বৈকালিক নিদ্রায় নিমগ্ন ছিল। এটি তাহার নূতন অভ্যাস। যত দিন সে সুরপতির আশ্রিতা ছিল, তত দিন মধ্যাহ্নের পর হইতেই তাহাকে সুরপতির চা ও খাবারের আয়োজন করিতে হইত। সে আয়োজনও প্রচুর ছিল সে সব গুছাইতে অনেকটা সময় লাগিত। এখন সেরূপ আয়োজনের কথা স্বপ্ন হইয়াছে। কোন কোন পক্ষ হইতে তাহাকে সুরপতির মতই প্রাচুর্য্যে পরিবেষ্টিতা রাখিবার প্রস্তাব আসিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও সে সেরূপ কোন প্রস্তাব গ্রহণ করে নাই—করিবে কি না, তাহাও স্থির করিতে পারিতেছিল না। এক একবার সে মনে করিত, দূর হউক ছাই—আর ও-পথে যাইব না; কিন্তু তখন সে আবার মনে মনে হাসিত। সে পথ কি সে ত্যাগ করিয়াছে? নরনাথ তাহার কে? পথ যখন সে ত্যাগ করে নাই, তখন অভাবের মুখে যাইবে কেন? যৌবন জোয়ারের জল—তাহার যৌবনে ভাঁটা ধরিতেছিল, প্রাচুর্য্যের ও প্রসাধনের বাহুল্যের বাঁধ দিয়া তাহাকে

চিরস্থায়ী করিয়া রাখা যাইবে না—তাহা সম্ভবও নহে। কিন্তু যৌবন গেলেও জীবন থাকিবে। তখন সে কি করিবে?—সে কি করিবে, ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। তবে এই দ্বিধার মধ্যেই নরনাথের প্রতি তাহার আকর্ষণ অন্তর্হিত হইয়াছিল। নরনাথকে সে আর যেন সহ্য করিতে পারিতেছিল না। অথচ এক দিন মনের আবেগে সে এই নরনাথকেই পাইবার আশায় সুরপতির কাছে বিশ্বাসহন্ত্রী হইয়াছিল—সে আশ্রয় ত্যাগ করিয়াও দুঃখিত হয় নাই। বোধ হয়, তখন সে পরিণাম বুঝিতে পারে নাই। এখন তাহা বুঝিয়া মনে করিতেছিল—সে ভুল করিয়াছিল।

পরিচারিকা যাইয়া তরঙ্গিণীকে সংবাদ দিল, নরনাথ আসিয়াছে।

তরঙ্গিণী নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে বলিল, "আপদ যায়ও না!—কি ভুলই করেছি!"

নরনাথ পার্শ্বের ঘরে চেয়ারে বসিয়া পড়িয়াছিল—সে ইহা শুনিতে পাইল। হয় ত বা তাহাকে শুনাইবার জন্যই তরঙ্গিণী একটু উচ্চকণ্ঠে কথা বলিয়াছিল।

পরিচারিকা বলিল, "মুখ-চোখ দেখে ত ভয় হচ্ছে, মদ খেয়ে এসেছেন, না—কি?"

তরঙ্গিণী তখনও শয্যায় শয়ন করিয়া ছিল, উঠে নাই। পরিচারিকার এই কথায় আলস্য ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিল; বলিল, "বলিস কি? মদ ত খায় না!"

"কি জানি—দেখে ত মনে হচ্ছে। আর তা যদি না হয়, তবে—চারদিকে যেরকম ব্যামো হচ্ছে—"

তরঙ্গিণী শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিল। তাহার শরীর হইতে আলস্য ও চক্ষু হইতে নিদ্রালসভাব মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইল। সে মুখে জল না দিয়াই

ব্যস্ত হইয়া পার্শ্বের ঘরে গেল। নরনাথকে দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে গা ?"

নরনাথ বলিল, "অসুখ বোধ হচ্ছে—মাথায় যন্ত্রণা—গায়েও ব্যথা মনে হচ্ছে।"

"বল কি ? আর এই অসুখ নিয়ে এসেছ ! বাড়ী থেকে বেরুলে কেন ?"

"আদালতে কায ছিল, তাই যেতে হয়েছিল।"

"তা কায সেরে বাড়ী গেলে না কেন ?"

কেন ? নরনাথ কেমন করিয়া বুঝাইবে, কোন্ মোহবশে সে আদালত হইতে বাড়ীতে না যাইয়া তাহার কাছে আসিয়াছে ! সে একবার তরঙ্গিণীর দিকে চাহিল। সে দৃষ্টিতে যে তিরস্কার ছিল, তাহা তরঙ্গিণীকে স্পর্শ করিল না ; তাহাতে যে অনুনয় ছিল, তাহাও তরঙ্গিণীকে আকৃষ্ট করিতে পারিল না।

নরনাথ উঠিল—মাতালের মত টলিতে টলিতে—সিঁড়িতে নমিবার সময় সে শুনিতে পাইল, তরঙ্গিণী পরিচারিকাকে বলিতেছে, চাকরদের ডেকে বল্—চেয়ারখানা রৌদ্রে দিয়ে গন্ধকের ধোঁয়া দিক। বাবা !—যেমন তেমন ব্যামো নয়—যেন রূপহারিণী হয়েই আসে।"

বাড়ীতে আসিয়াই নরনাথ শয্যায় শয়ন করিল।

তাহার মুখচোখের অবস্থা দেখিয়া ভৃত্য শঙ্কিত হইয়াছিল, এখন তাহাকে শয়ন করিতে দেখিয়া শ্রীমতীকে সংবাদ দিল।

অবনীমোহনের সহিত যেদিন নরনাথের কথা কাটাকাটি হয়, সেই দিন হইতে স্বামিস্ত্রীর মধ্যে ভাবান্তর সপ্রকাশ হইয়াছিল।

ইদানিং নরনাথ আর শ্রীমতীর সঙ্গে বড় কথা কহিত না—কিন্তু

শ্রীমতীর সেবা-যত্ন সে বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রহণ করিত। শ্রীমতীও সংসারের প্রয়োজনীয় কথাই শুধু স্বামীকে বলিত। আজ ভৃত্যের কাছে সংবাদ পাইয়া সে ব্যস্ত হইয়া স্বামীর কাছে আসিল—অতীতের সব ব্যথা সে ভুলিয়া গেল।

স্বামীর কাছে আসিয়া তাহাকে দেখিয়া শ্রীমতীর মনে বিপদের ছায়াপাত হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে?"

নরনাথ বলিল, "বোধ হয়, বসন্ত হ'বে।"

শ্রীমতী মূহূর্ত্তমাত্র পাষাণ-প্রতিমার মত নিশ্চল হইয়া রহিল "তাহার পর বলিল, "ডাক্তারকে খবর পাঠাই।"

"তুমি আমার কাছে থেক'না—রোগ বড় ছোঁয়াচে। আমি ভাবছি, হাঁসপাতালে গেলে ভাল হয়।"

"তুমি বল কি!"—বলিয়া শ্রীমতী চলিয়া গেল এবং ভৃত্যকে ডাক্তারের বাড়ী পাঠাইয়া—তাহার দাদাকে ও শাশুড়ীকে পত্র লিখিয়া আসিয়া স্বামীর কাছে বসিল।

নরনাথ জিজ্ঞাসা করিল, তুমি এলে কেন?"

শ্রীমতী বলিল, "আমাকে আস্‌তেই হ'বে।"

"খোকা ত তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না!"

"ছোট বড়ঠাকুর সে দিন যে এসেছিলেন, তখন তা'র টীকা দিইয়ে গেছেন—ভয় নেই।"

"তুমিও টিকা নিয়েছ?"

শ্রীমতী কোন উত্তর দিল না। নরনাথ মনে করিল, সে-ও টিকা লইয়াছে। সে কতকটা নিশ্চিন্ত হইল।

ডাক্তার আসিয়া বলিয়া গেলেন, বসন্ত—বোধ হয় উগ্র।

শ্রীমতীর মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

রোগ উগ্রই বটে! দেখিতে দেখিতে নরনাথের সর্ব্বাঙ্গ স্ফোটকে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। কি বেদনা! কি যাতনা!—আর কি সেবা! শ্রীমতী যেন আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল—তাহার আর কোন জ্ঞান ছিল না; সে কেবল স্বামীর সেবা করিতেছিল।

শরীর যত দুর্ব্বল হইতেছিল, নরনাথের মন তত কোমল হইয়া আসিতেছিল। তরঙ্গিণী—যাহার মোহে সে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছিল, সেই তরঙ্গিণী তাহার রোগসম্ভাবনা বুঝিয়া তাহাকে দূর করিয়া দিয়াছে; আর শ্রীমতী? নরনাথের বুকের মধ্যে অনুতাপের ক্রন্দন যেন ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিত—চক্ষু ছাপাইয়া অশ্রু ঝরিত। শ্রীমতী মনে করিত, স্বামীর রোগ-যন্ত্রণায় কাতর নয়নাশ্রু!

দেহ যত দুর্ব্বল হইতে লাগিল, নরনাথ ততই শিশুর মত অসহায় হইয়া পড়িতে লাগিল, তত সে শ্রীমতীর ব্যবহারে তাহার পূত প্রেমের —যে-প্রেম ভক্তির নামান্তর—যাহা পূজা, তাহার পরিচয় পাইতে লাগিল। তাহার হৃদয় আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইতে লাগিল।

মা'কে লইয়া অবনীমোহন ও শাশুড়ীকে লইয়া হরনাথ আসিয়া-ছিল। খোকাকে তাহাদের কাছে দিয়া শ্রীমতী যেন অনন্যকর্ম্মা হইয়া স্বামীর সেবা করিতেছিল। খোকা মা'র কাছে যাইবার জন্য কাঁদিলেও সে ভয়ে ছেলেকে একবার বুকে লইত না—পাছে তাহার সংস্পর্শে রোগবিষ পুত্রকে স্পর্শ করে। কয় দিন কাঁদিয়া ও বায়না ধরিয়া খোকাও ঠাকুরমা'র ও দিদিমা'র কোলে থাকিতেই অভ্যস্ত হইল—শ্রীমতী নিশ্চিন্ত হইল।

ডাক্তার, শীতলার "ঠাকুর", ঝি, চাকর সকলেই তাহার অপূর্ব্ব সেবার

বিস্মিত হইলেন। বিশেষ যাঁহারা জানিতেন, কিছু দিন হইতে নরুর স্ত্রীকে কি বেদনা দিয়াছে, তাঁহারা ভাবিলেন, এমন গুণবতী স্ত্রীকেও লোক অবহেলা করিতে পারে!

আহার নাই, নিদ্রা নাই, বিশ্রাম নাই—শ্রীমতী স্বামীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার সেবা করিতে লাগিল। রোগের কণ্টকশয়নে থাকিয়া শরশয্যার যন্ত্রণাও যেন নরনাথের কাছে এই সেবায় প্রশমিত হইতে লাগিল; আর সঙ্গে সঙ্গে তাহার আত্মগ্লানির যাতনা বাড়িয়া উঠিল।

মা কত অনুরোধ করিতেন, তিরস্কার করিতেন—"শরীরে যে সইবে না; একটু বিশ্রাম কর"; শাশুড়ী কত বলিতেন, "মা লক্ষ্মী, আমরা নরুর কাছে আছি, তুমি একটু জিরিয়ে নাও"—শ্রীমতী কাহারও কথা শুনিত না। সে কেবল অনন্যকর্ম্মা হইয়া স্বামীর সেবা করিত; আর দেবতাকে ডাকিত—"হে ঠাকুর, যদি জীবন না লইলে তোমার তৃপ্তি না হয়—আমি নারী, আমার এই অসার, লাঞ্ছিত জীবন লও—কিন্তু আমার স্বামীর জীবন লইও না; পুরুষের জীবন বড় মূল্যবান্।" সে মনে করিত, সে যদি যাইতে পারে তবে সে আপনাকে ভাগ্যবতী বলিয়া বিবেচনা করিবে। তাহার রূপ নাই—সে স্বামীর ভালবাসায় বঞ্চিত হইয়াছে; এখন তাহার পক্ষে বাঁচিয়া থাকাই দুঃখ, আর সে মরিলে স্বামী হয়ত মনের মত স্ত্রী পাইয়া সুখী হইবেন। কেবল যখন সে খোকার কথা মনে করিত, তখনই বুকের মধ্যে যেন কেমন কর-কর করিয়া উঠিত।

এই অলৌকিক সেবাযত্নের মধ্যে একদিন নরনাথ আর আপনার হৃদয়ের ভাব গোপন করিয়া রাখিতে পারিল না—ক্ষতবেদনাদুর্ব্বল হস্তে

শ্রীমতীর হাত ধরিয়া বলিল, "শ্রীমতী, আমাকে ক্ষমা ক'রো, আমি মহাপাপী"—তখন শ্রীমতী মনে করিল, তাহার এত দিনের দুঃখ কেবল দুঃস্বপ্ন—তাহা যথার্থ নহে।

নরনাথ বলিল, "জানি, যদি বেঁচে উঠি, তোমার সেবায় আর তোমার পুণ্যেই বেঁচে উঠবো; নইলে আমার বাঁচবার আর কোন আশাই ছিল না···অবশ্য বাঁচবার কোন অধিকারও আমার নেই।"

শ্রীমতী কোন উত্তর দিতে পারিল না—অশ্রুর উচ্ছ্বাস তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ করিয়া দিল। ··· ··· ···

এই সেবা—এই যত্ন—আর এই প্রার্থনা ব্যর্থ হইল না—ধীরে ধীরে নরনাথ সুস্থ হইয়া উঠিতে লাগিল। চিকিৎসক আশ্বাস দিলেন—আর ভয় নাই।

নরনাথ ব্যাধিমুক্তির পথে যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই তাহার মনে হইতে লাগিল, সে কি ভুল করিয়াছিল! যে শ্রীমতী তাহার সকল সাফল্যের মূল—যে শ্রীমতীর জন্য অনিবার্য্য নিরাশ্রয়তা হইতে মুক্তি পাইয়াছে—যে শ্রীমতীর জন্য আজ সে মৃত্যুর কবল হইতেও রক্ষা পাইল,—তাহাকে উপেক্ষা করিয়া, তাহার ভালবাসা অবহেলা করিয়া সে রূপের মোহমুগ্ধ হইয়া পঙ্কিল পথে তরঙ্গিণীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল! যে তরঙ্গিণী সুরপতির মত আশ্রয়দাতার কাছে বিশ্বাসহন্ত্রী হইতে পারে, সে যে দরিদ্র নরনাথকেও দূর করিয়া দিবে, ইহাতে কি বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে? সে তাহাও বুঝে নাই, অথচ সে মনে করে, সে মহা বুদ্ধিমান্!

দারুণ এই ব্যাধিকেও সে সময় সময় মঙ্গল বলিয়া মনে করিত—কারণ এই ব্যাধিই তাহাকে মোহমুক্ত করিয়াছে, তাহার ভুল ভাঙ্গিয়া

দিয়াছে, তাহাকে শ্রীমতীর দেবীত্ব দেখাইয়াছে। সে যদি ব্যাধিগ্রস্ত না হইত, তবে তাহার কি হইতে পারিত—মনে করিয়া সে শঙ্কায় শিহরিয়া উঠিত।

[১৪]

শ্রীমতীর অন্তরের আকুল প্রার্থনা অদৃষ্ট-দেবতা শুনিয়াছিলেন, তাহার স্বামীকে রোগমুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার আর একটি প্রার্থনাও তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল—'যদি জীবন না লইলে তাঁহার তৃপ্তি না হয়, তবে তিনি যেন তাহার অসার নারীজীবন লইয়া তাহার বিনিময়ে নরনাথের মুল্যবান্ জীবন দান করেন।' দিন নাই, রাত্রি নাই—আহার নাই, নিদ্রা নাই—পক্ষাধিককাল এইভাবে কাটিয়াছিল; শ্রীমতীর দেহ একান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। সে দেহে রোগবিষ অতি সহজে সংক্রামিত হইয়াছিল।

একদিন রাত্রিকালে শ্রীমতী ভাল ঘুমাইতে পারিল না—সকালে উঠিয়া মস্তকে যন্ত্রণা অনুভব করিল। সে তাহা গ্রাহ্য করিল না। কিন্তু দিনের মধ্যে সর্ব্বাঙ্গে বেদনা অনুভূত হইল—জ্বর দেখা দিল।

ডাক্তার আসিলেন—পরীক্ষা করিয়া এবং সমস্ত তথ্য অবগত হইয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "করেছেন কি! বসন্তরোগীর সেবা করেছেন, আর নিজে টিকা নেন নি!"

শ্রীমতী কোন কথা বলিল না।

তাহার মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "খোকার ত টিকা দিয়ে দিয়েছিলি; নিজে নিস্‌নি কেন?"

শ্রীমতী বলিল, "মেয়েমানুষের কি মা মরণ আছে?"

মা'র চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল।

শ্রীমতী শয্যা লইল। শীতলার "ঠাকুর" মুখ গম্ভীর করিয়া বলিয়া গেলেন, "বড় উগ্র আক্রমণ হয়েছে। বাবুকে বাঁচালাম বটে ; কিন্তু— দেখি কি হয় ; সবই মা'র ইচ্ছা।"

শ্রীমতীর শাশুড়ীর কোলে তাহার ছেলেকে দিয়া তাহার মা আসিয়া শয্যাপার্শ্বে বসিলেন।

নরনাথ কেবল আরোগ্যস্নান করিয়াছে ; সে তখনও সেই ঘরেই রহিল।

শ্রীমতীর মনে হইল, তাহার কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে, সে স্বামীকে বাঁচাইয়াছে। মরিতে তাহার ভয় কি ? সে পূর্ব্ব হইতেই মনকে প্রস্তুত করিয়াছিল। প্রথম প্রথম খোকার জন্য মন কেমন করিত, ক্রমে সে ভাবও কমিয়া আসিয়াছিল। হিন্দুনারী চিরাগত সংস্কারবশে মৃত্যুকে ভয় করে না—তবে যত দিন সংসার তাহাকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারে, তত দিনই কেবল মরণে তাহার অনিচ্ছা। শ্রীমতীর পক্ষে সে আকর্ষণ আর ছিল না। সে যেন সব ভুলিয়া স্বামীকে ভালবাসিয়াছিল—স্বামীর ভালবাসার মত কাম্য তাহার আর কিছুই ছিল না—স্বামীর সামান্য সুখের জন্য সে আপনি সব যন্ত্রণা হাসিমুখে সহ্য করিতে পারিত ; সে স্বামীর সোহাগে আপনাকে পরম ভাগ্যবতী বলিয়া মনে করিত। তাই যে দিন সে বুঝিয়াছিল, নরনাথ আর তাহাকে ভালবাসে না, সে দিন তাহার পক্ষে জীবনে আর কোন আকর্ষণ ছিল না। তবুও সে কর্ত্তব্য-বোধে স্বামীর সেবা করিয়াছে—তাহার পর মৃত্যুমুখ হইতে স্বামীকে বাঁচাইয়া আনিয়া পরম তৃপ্তি পাইয়াছে। মরিতে তাহার আর কোন ভয়

—কোন বিতৃষ্ণা ছিল না। বরং সে মনে করিতেছিল, স্বামীকে বাঁচাইয়া এখন যদি সে মরিতে পারে, সে-ই পরম ভাগ্য। স্বামীর ব্যবহারে সে বুকে যে বেদনা পাইয়াছে, তাহা হইতে মুক্তিলাভই ত সুখ!

প্রথমে সে ঔষধ ব্যবহার করিতে অস্বীকার করিল। কিন্তু তাহার সে সঙ্কল্প অবিচলিত রাখা তাহার পক্ষে সম্ভব হইল না। কারণ, তাহার মাতার অশ্রু তাহার সে সঙ্কল্প ভাসাইয়া লইয়া গেল। তাহাকে ঔষধ ব্যবহার করিতে হইল।

কিন্তু "ঠাকুর" প্রথমেই বুঝিয়াছিলেন, ব্যাধি বড় উগ্র। তাঁহার সহস্র রোগীতে পরীক্ষিত ঔষধ কোনরূপ ফলপ্রদ হইল না।

শ্রীমতী অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল। কিন্তু সে এমন ধীর ও শান্তভাবে সব সহ্য করিতে লাগিল যে, তাহাকে দেখিয়া অর্থাৎ রোগীর বাহ্যবিকাশে সে যন্ত্রণার কথা বুঝিতে পারা যাইত না। সে কেবল তাহার মা'কে বলিত, "মা, তোমার যত কষ্টই কেন হ'ক না—তোমার কোলে যদি মরতে পারি, সে আমার কি ভাগ্য!"

মা শুনিয়া অশ্রুবর্ষণ করিলে সে বলিত, "কেঁদ না মা, মেয়েমানুষের জীবন—যেতে পারলেই ভাগ্য ব'লে মনে করতে হয়। অদৃষ্টের কথা মনে করলে ভয় হয়—না জানি, আরও কত কষ্ট আছে। এর পর হয়ত এমন ক'রে সেবা করবারও কেউ থাকবে না।"

নরনাথ সেই ঘরেই থাকিত। এ সব কথা সে শুনিতে পাইত। অনুতাপে ও আত্মগ্লানিতে তাহার মোহ দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। সে আপনার ভুল বুঝিয়াছিল। শ্রীমতীর এইরূপ কথায় তাহার বুকের মধ্যে বেদনা ও ক্রন্দন যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। সে যে মহাপাপী! কিসে তাহার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে? এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত

তাই—”বলিতে বলিতে শ্রীমতী যেন আর আপনাকে সামলাইতে পারিল না, আর কথা বলিতে পারিল না।

তাহার মাতা ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

আর এক জনের নেত্র হইতে অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরিতে লাগিল। নরনাথ উৎকর্ণ হইয়া শ্রীমতীর কথা শুনিতেছিল। সে ইহা শুনিয়া বুকের মধ্যে অবর্ণনীয় যাতনা অনুভব করিল। এই কি তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত?—যে শ্রীমতী তাহার কুব্যবহারের পরিবর্ত্তে আপনার জীবন দিয়া তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছে, সে কি তাহার নিকট আপনার অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিবার অবকাশও আর পাইবে না? এই দারুণ দুঃখ লইয়া তাহাকে সঙ্গিহীন—শ্রীমতীহীন দীর্ঘ-জীবন যাপন করিতে হইবে? এখন হইতে কি ক্রন্দনই তাহার জীবনের সম্বল হইবে?

মা খোকাকে আনিলেন।

শ্রীমতীর স্নেহপূর্ণ তৃষাতুর নেত্র একবার পুত্রের দিকে চাহিল; তাহার পরই তাহার মাতৃহৃদয় পুত্রের বিপদসম্ভাবনায় শঙ্কিত হইয়া উঠিল। সে তাহার মাতাকে বলিল, “মা, আমি দেখেছি। তুমি খোকাকে নিয়ে যাও—মা’কে বল, তিনি এর জামা বদলে দিন—তুমি কোলে ক’রে এনেছ।”

মা তাহার পুত্রকে লইয়া চলিয়া গেলেন—যতক্ষণ দেখিতে পাইল, ততক্ষণ শ্রীমতী তাহাকে দেখিল, তাহার পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। সে বুঝিয়াছিল, বুঝি আর সে পুত্রকে দেখিতে পাইবে না।

সেই দিনই চিকিৎসক বুঝিয়া গেলেন, রোগের আর চিকিৎসা নাই। তিনি ঔষধ বাদ দিয়া শ্রীমতীকে কেবল দেবতার চরণামৃত দিলেন;

বলিলেন, "মা, তুমি মা-শীতলাকে ডাক, তিনিই তোমায় আরোগ্য ক'রে দেবেন।"

শ্রীমতী মলিন হাসি হাসিয়া বলিল, "মা, বোধ হয়, তাঁ'র অভাগিনী মেয়েকে কোলে স্থান দেবেন।"

শ্রীমতীর মা কাঁদিতে লাগিলেন।

আর অদূরে রোগশয্যায় শয়ন করিয়া নরনাথ কাঁদিতে লাগিল। তাহার মনে হইতেছিল, শ্রীমতীর মৃত্যুর জন্য সে-ই দায়ী। সে-ই তাহাকে হত্যা করিয়াছে। সে মহাপাপী—আত্মগ্লানির দাহ সহ্য করিয়া তাহাকে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে বলিয়াই তাহার মৃত্যু হয় নাই। সে কেবল আপনার জীবনের ইতিহাসের আলোচনা করিতেছিল—কেমন করিয়া ধীরে ধীরে সে আদর্শভ্রষ্ট হইয়াছিল, পাপকে পাপ বলিয়া মনে করিতে ভুলিয়াছিল, পাপের পঙ্কিল ও পিচ্ছিল পথে অগ্রসর হইয়া কর্ত্তব্যজ্ঞান হারাইয়াছিল—তাহার পর, আজ সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তকাল সমাগত। সত্যই কি শ্রীমতী বাঁচিবে না? শ্রীমতী তাহাকে মৃত্যুর দ্বার হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছে; সে সাধ্বী, তাহার প্রবল ভালবাসার কাছে, পূত প্রেমের কাছে মৃত্যুও পরাভব মানিয়াছে। সে যে আপন চরিত্রের মাধুর্য্য হারাইয়াছে! সে কেমন করিয়া আশা করিবে, তাহার ভালবাসা শ্রীমতীকে মৃত্যুর হাত হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়া তাহাকে দিবে? সে ত আশা করিতে পারে না। শ্রীমতী তাহাকে কত ভালবাসিয়াছে! সে যে—ভালবাসার উপযুক্ত নহে, তাহাকে সেই ভালবাসা দিয়াছে। শ্রীমতীর সেবা শুশ্রূষার কি তুলনা হয়?

ভাবিতে ভাবিতে নরনাথের নয়ন হইতে দরবিগলিতধারে অশ্রু

ঝরিতে লাগিল। সে ভাবিল,—শ্রীমতী যদি না বাঁচে, তবে সে কি লইয়া বাঁচিয়া থাকিবে? স্মৃতির ও অনুতাপের অনল হৃদয়ে লইয়া তাহাকে দীর্ঘ জীবন-পথ অতিক্রম করিতে হইবে। হায়, তাহাই কি তাহার নিয়তি? তখনই তাহার মনে হইল—তাহাই বটে; তাহাই তাহার প্রায়শ্চিত্ত; সেইজন্যই সে মৃত্যুর মুখ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে! আজ অধীর হইলে চলিবে কেন? শ্রীমতীর মনে যে ব্যথা দিয়াছে, তাহার শতগুণ ব্যথা সে পাইবে, তবে তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে; তবে সে শ্রীমতীর ক্ষমা পাইবার উপযুক্ত হইবে—নহিলে নহে।

সেদিন রাত্রিকালে নরনাথ ঘুমাইতে পারিল না। মধ্যরাত্রির পর হইতে শ্রীমতী যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে বুঝিল, এইবার শেষ। তাহার পূর্ব্বে একবার—হায় নারীর ভালবাসা! শ্রীমতী মাকে বলিল, "মা, একবার আমায় পাশ ফিরিয়ে দিতে পারবে?"

মা বুঝিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি যে দিকে নরনাথের শয্যা ছিল সেই দিকে শ্রীমতীকে পাশ ফিরাইয়া দিলেন। শ্রীমতীর একটি চক্ষুর শেষ ক্ষীণ দৃষ্টি স্বামীর মুখ সন্ধান করিল।

নরনাথ ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

শ্রীমতীরও নয়নে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল।

প্রাতঃকালে দীননাথ, হরনাথ ও অবনীমোহন নীচের ঘরে বসিয়াছিলেন। এইমাত্র শীতলার 'ঠাকুর' আসিয়া জানাইয়া দিয়াছেন—

শ্রীমতীর জীবনের আর কোনো আশা নেই ।" সকলেই মাথায় হাত দিয়া অশ্রু মোচন করিতেছিলেন ।

এই সময় শিবনাথ উপর হইতে নামিয়া আসিয়া বলিল, "সব শেষ হ'ল—পালিত-পরিবারের লক্ষ্মী আমার বিদায় নিলেন। আমরা তাঁ'কে রাখতে পারলাম না ।" বলিতে বলিতে সে দু'হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিল ।

দ্বিতলে শ্রীমতীর মাতার ক্রন্দন ধ্বনি ধ্বনিত হইল—"মা আমার—কি করলি মা ?"

সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতীর শাশুড়ীও কাঁদিয়া উঠিলেন ।

দীননাথ হতবুদ্ধির মত বসিয়া রহিলেন ।

শিবনাথ ও হরনাথের অনুসরণ করিয়া অবনীমোহন দ্বিতলে চলিল ।

সকলে উপরে যাইয়া রোগীর ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, শ্রীমতীর সকল যন্ত্রণার অবসান হইয়াছে ! মৃত্যু তাহার মুখ হইতে রোগ-যাতনার সব চিহ্ন মুছিয়া তাহাতে স্নিগ্ধ প্রশান্তি ঢালিয়া দিয়াছে । জ্ঞানলোপ হইবার পূর্ব্বেই সে জননীর নিকট চাহিয়া লইয়া কৌটা শূন্য করিয়া যে সিন্দুর পরিয়াছিল, তাহার তৈলহীন রুক্ষ কেশমধ্য হইতে তাহা যেন শরতের ধূসর আকাশে তরুণ অরুণের শোভা বিকাশ করিয়া শোভা পাইতেছে ! আর রোগশয্যা হইতে উঠিয়া আসিয়া নরনাথ শ্রীমতীর শবের উপর মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতেছে !

শ্রীমতীর মাতা ও শাশুড়ী হর্ম্ম্যতলে পড়িয়া আছেন ।

শ্রীমতীর শব খাটের উপর শয্যায় শায়িত করিয়া সকলে ফুল দিয়া তাহা সাজাইয়া দিলেন। বিবাহের সময় শ্রীমতী যে বেনারসী শাড়ী পরিয়াছিল, সেই খানি তাহার শবের উপর আস্তৃত করিয়া দেওয়া হইল। অলক্তকের রক্তরাগ তাহার আস্তরণমুক্ত চরণদ্বয়ে শোভা পাইতে লাগিল। আর তাহার সীমন্তে সিন্দুর তাহার সাধব্য সৌভাগ্যের নিদর্শনরূপে সমুজ্জ্বল দেখাইতে লাগিল।

দ্বিতলে, শ্রীমতী যে বিছানায় শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহারই উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া নরনাথ গড়াগড়ি দিয়া রোদন করিতেছিল। নরনাথের আজ মনে হইতেছিল—সে শ্রীমতীর উপযুক্ত নহে বলিয়াই সে তাহাকে ত্যাগ করিয়া গেল। তাহার স্মৃতির ও অনুতাপের প্রভাবে আজ তাহার মনে হইল,—অসাধারণ ত্যাগ শ্রীমতীর মৃত্যু-পরশ-কাতর মুখে যে সৌন্দর্য্য-শ্রী সৃষ্টি করিয়াছিল, সে সৌন্দর্য্য-শ্রী সে আর কখন দেখে নাই।

জীবনে সে যাহা বুঝিতে পারে নাই—আজ মৃত্যু তাহাকে তাহাই বুঝাইয়া দিল।

শেষ